জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন

এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্
নিবন্ধন নং: ২৩১
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অক্টোবর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমি এই গবেষণা কর্মটি ইতিপূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য পেশ করিনি। এটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করলাম।

মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম. ফিল. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩ – ২০০৪
রেজি. নং: ২৩১
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন' শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছে। এই শিরোনামের গবেষণা কর্মটি আমার জানা মতে সে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য ইতিপূর্বে পেশ করেনি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন স্যার-এর কাছে সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তিনি সানন্দে এ কাজটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। কেবল গবেষণার জন্য নয়, বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য লেখকের বই অধ্যয়নে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্যও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকালীন সময় আমার অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আমি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ।

মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্
তারিখ: ০৫/১০/২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন

সূচিপত্র		পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	১–৪
	প্রথম অধ্যায়	৫ – ৪৯
১.	জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ	
১.১	অস্তিত্ববাদের পটভূমি	৫ – ২৪
১.২	অস্তিত্ব ও অস্তিত্ববাদী দর্শন	২৫ – ৩৬
১.৩	অস্তিত্ব ও শূন্যতা	৩৭ – ৪৪
১.৪	স্বকামধর্মী অহং (নার্সিসাস মননশীলতা)	৪৫ – ৪৯
	দ্বিতীয় অধ্যায়	৫০ – ৮৪
২.	জাঁ-পল্ সার্ত্রের মানবজীবন সম্পর্কিত ধারণা	
২.১	মানবজীবনে চেতনার প্রকৃতি	৫০ – ৫৯
২.২	মানবজীবনে স্বাধীনতা	৬০ – ৬৮
২.৩	মানবজীবনে দ্বন্দ্ব ও হতাশা	৬৯ – ৭৬
২.৪	বাস্তব সত্তার বিবরণ (ফ্যাক্টিসিটি) ও যথার্থ অস্তিত্ব	৭৭ – ৮৪
	তৃতীয় অধ্যায়	৮৫ – ১২৫
৩.	জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন	
৩.১	অস্তিত্ববাদ ও সাহিত্য	৮৫ – ৯২
৩.২	অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ	৯৩ – ১০৫
৩.৩	ব্যক্তি মানুষের জীবন ও অস্তিত্ববাদ	১০৬ – ১১২
৩.৪	আমি ও অপর ব্যক্তি	১১৩ – ১১৮
৩.৫	অস্তিত্ববাদের সাম্প্রতিক লক্ষ্যধারা	১১৯ – ১২৫
৪.	উপসংহার	১২৬ – ১৩১
৫	গ্রন্থপঞ্জি	১৩২ – ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় সমগ্র ইউরোপ যখন একটি মৃত উপত্যকায় পরিণত হয় এবং গোটা বিশ্বের মানবজাতি রক্তাক্ত, আহত, পীড়িত ও মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিল তখন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে বোদ্ধা মহল সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে গোটা মানবজাতির শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বনন্দিত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রে। তাঁর জন্ম ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ১৯০৫ সালের ২১ জুন। ১৫ মাস বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর মাতা আনেমারি ছিলেন ১৯৫২ সালে শান্তিতে নোবেল জয়ী আলবার্ট সোয়াইজারের (Albert Schweitzer) ভাইয়ের মেয়ে। তাঁর কাছেই তিনি লালিতপালিত হন। শৈশবে তার জীবন গঠনের ওপর বড় অবদান ছিল নানা চার্লস শোয়েটজারের (Charles Schweitzer)। তাঁর প্রভাবে শৈশবেই সার্ত্রে খুঁজে পান নিজের জগৎ, ছোট ছেলেটি অবলীলায় বলে–অবশেষে আমি আমার ধর্ম খুঁজে পেয়েছি, বইয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে আর কিছুই নয়, গ্রন্থাগারই আমার উপাসনালয়। তাইতো তিনি একাগ্রচিত্তে অসংখ্য বই অনুশীলনের মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন একজন দার্শনিক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, বিপ্লবী, সমাজতান্ত্রিক শিল্পী, রাজনীতিক, সমালোচক ও অসাধারণ বিবেকবান মানুষ। তাঁর দার্শনিক জীবন শুরু হয়েছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে। তিনি একদিকে প্রচলিত রীতিনীতির তোয়াক্কা করতেন না। অপরদিকে যা তাঁর কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে তা তিনি অকপটে প্রকাশ করতেন। এজন্য তাঁকে বহুবার পুঁজিবাদী ও সম্রাজ্যবাদীদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে এবং বেশ কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি তিনি নিজ দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে আলজেরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে করেছিলেন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের কট্টর সমালোচকও ছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন তাঁকে সঠিক সময়ে এ পুরস্কার দেওয়া হয়নি বলে এবং ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কারণে। ব্যক্তির স্বাধীন বিশ্বাসকে তিনি সমর্থন করতেন। তিনি মনে করতেন, বিশ্বাসের ভূমি ও বিশ্বাসের সততার যদি জোর থাকে তবে সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। নির্যাতিত ব্যক্তির পক্ষে এবং সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এই মহান চিন্তানায়কের দর্শনের মূল সারবস্তুই ছিল অস্তিত্ববাদ (Eixtentialism)। তিনি তাঁর তত্ত্বের আড়াল থেকে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "Existence is prior to essence" অর্থাৎ-মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব তার সাধারণ সত্তার পূর্বে। মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রথমে মানুষ আসবে, তারপর স্বাধীনতা আসবে বিষয়টি এমন নয়। মানুষের সত্তা এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনো তফাত নেই। এই স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের জীবন জুড়ে সক্রিয় থাকে। এই মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সুসংহত রূপ দেন এবং বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হন। মানুষের অস্তিত্ব আজও

সারা বিশ্বে হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায়, জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চা ও গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। অস্তিত্ববাদের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা মানবজীবনের সাথে এর সম্পর্ক এবং বাঙালির জীবনে এ দর্শনের বাস্তবতা ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যৌক্তিকতা অনুসন্ধানের নিমিত্তেই বর্তমান গবেষণা কর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ও অপরের দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার এবং বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনে জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন কী ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে তা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা এবং ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে জাঁ-পল সার্ত্রে উপলব্ধি করেন যে, শাসক শ্রেণি নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে প্রতিটি ব্যক্তির অস্তিত্বকে যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। তাঁদের কাছে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের চেয়ে সার্বিক সত্তা হিসেবে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা, অন্য দেশের সম্পদ হরণের জন্য পেশিশক্তি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নব্য উপনিবেশবাদ সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধসহ খণ্ড খণ্ড যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। তবে যুদ্ধ সৃষ্টি বা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তির চেয়ে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তাই দায়ী, তা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল্ সার্ত্রে বিভিন্ন ঘটনা, নাটক, গল্প ও দার্শনিক গ্রন্থে দেখিয়েছেন। যুদ্ধ ও অন্য কোনো উপায়ে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ যে কেবল মানুষই বন্ধ করতে পারে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের যৌক্তিক মতামত বিবেচনার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা করা যেতে পারে, এ দর্শন প্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল্ সার্ত্রে। ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন চেতনা কীভাবে কাজ করে এবং স্বাধীন চেতনার কাছে ঈশ্বর যে কত দুর্বল তা জাঁ-পল সার্ত্রের 'মাছি' নাটকে অরেস্টিসের চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কেননা মানুষ তার স্বাধীনতা দ্বারা নিজস্ব শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পৃথিবীকে জয় করেছে এবং ঈশ্বরকে অস্বীকার করে যেকোনো কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন গবেষণায় যেসব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব কীরূপ হবে, সে কি শুধু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকবে নাকি বিশ্বশান্তি রক্ষায় সহযোগিতা করবে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নিঃসন্দেহে সার্ত্রে একজন বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তাঁর দর্শন কেবল জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করে না, এসবের পরিবর্তন করতে চায়। দর্শনের ভাবনাকে তিনি শুধু তত্ত্ব হিসেবে রেখে দেননি, এসবের মূল্য যাচাই করে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর সদাজাগ্রত বিবেক ও দায়িত্ববোধ সর্বকালে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুকরণীয় হয়ে থাকেবে। তিনি আশাবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ছিল মনুষ্যত্ব অর্জন। আদর্শের প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান এক আপসহীন যোদ্ধা। যিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করার সংকল্পে এক আপসহীন সমাজতান্ত্রিক যোদ্ধা। এক কথায় বলা যায়, প্রবল চিন্তাশক্তির পাহাড় ছিলেন তিনি। তাঁর এই চিন্তার উৎস ও

অনুরনন ছিল মস্তিষ্ক থেকে হৃদয় অবধি ব্যাপ্ত। চিন্তার এই আণবিক ক্ষমতা এবং সততার যোগসূত্র বিশ শতকের আর কোনো মনীষীর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর সতীর্থ অনেকে মনে করতেন, বোধ হয় এক ঘুমানোর সময় ছাড়া সার্ত্র সর্বক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন।

Awfm›'‡fi MVb cwiKíbv **(Proposed structure)** : আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভে তিনটি অধ্যায় থাকবে। এগুলো নিম্নরূপ :

c_g Aa¨vq : এ অধ্যায়ে কীভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে, এ দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলনা করে এবং সর্বশেষে জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে ।

wØZxq Aa¨vq : এ অধ্যায়ে জাঁ-পল্ সার্ত্রের মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। মানবজীবনে অস্তিত্ব ধারণ করে আছে যে দেহধারী মানুষ, সেই মানুষের জীবনের সাথে যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট তা হলো চেতনা, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ, যথার্থতা ও সম্ভাবনা, যা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সাথে জড়িত অতিবাস্তব সমস্যা যেমন, ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাব, ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, হতাশা, ভয়, উদ্বেগ, মনস্তাপ, শূন্যতা, বাস্তবতা অস্বীকার, যথার্থ-অযথার্থ অস্তিত্ব ও ব্যক্তির নিজস্ব বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত সফল না হওয়ার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ।

ZZxq Aa¨vq : এ অধ্যায়ে জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও আমাদের সময়ে এ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে যেসব প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন, ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে অপর ব্যক্তি প্রতিবন্ধক না সহায়ক, ব্যক্তির স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ ও যথার্থ মননশীলতা। সর্বোপরি এ দর্শনের গবেষণা থেকে সংগৃহীত ফলাফল কীভাবে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার একটি সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার তিনটি বিষয় প্রমাণ করা চেষ্টা করার হয়েছে, তা হলো, ১. ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ, ২. পুর-সোঁয়া হিসেবে ব্যক্তিসত্তা সারসত্তা আগে এবং ৩. ব্যক্তিসত্তার যথার্থতা ও মানবতা।

Dcmsnvi

একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি থাকবে।

(ক) M‡elYvi cwiwa (Scope) : জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন নামক বিষয়ের মধ্যে গবেষণা কর্মটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

(L) M‡elYvi c×wZ (Research methodology) : বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও প্রয়োগমূলক।

(M) cv_wgK Drm (Primary source) : জাঁ-পল্ সার্ত্রের নিজস্ব লেখা গ্রন্থ।

(N) wØZxq Drm (Secondary source) : জাঁ-পল্ সার্ত্রের দর্শনের ওপর বিভিন্ন ধরনের লেখা জার্নাল ও প্রবন্ধাদি।

(O) M‡elYvi AvbgwbK mgq cwiwa (Expected research time form) : দুই থেকে তিন বছর।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

1. Rv-cj mv‡Îi A¯ÍZev‘ I gvbeRxeb

1.1 A¯ÍZev‘x ‘k‡bi cUfwg

প্রতিটি দার্শনিক চিন্তাই পূর্ববর্তী মতবাদ খণ্ডন, সংশোধন ও প্রতিবাদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অস্তিত্ববাদী দর্শন এর ব্যতিক্রম নয়। অস্তিত্ববাদী দর্শন হলো বিশ শতকের এক শক্তিশালী ধারা। এ ধারার প্রায় সকল দার্শনিকই ব্যক্তিসত্তার পূর্বে সাধারণ সত্তাকে স্বীকার করার বিরোধী। আর নৈতিকতা বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এ ধারার দার্শনিকরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। অস্তিত্ববাদীদের মূলত দুটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়। যথা: আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ। জাঁ-পল-সার্ত্রে ছিলেন নাস্তিক্যবাদ ধারার অনুসারী। তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল ঈশ্বরবিহীন স্বাধীন সত্তা দ্বারা নির্বাচিত জীবন। তাঁর অস্তিত্ববাদ দর্শনের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য প্রথমেই ঈশ্বরের অস্বীকার করেন। এ নাস্তিকতাই সার্ত্রের দর্শনের মূল উৎস। সার্ত্রে সবার স্থান দিয়েছেন, মানুষকে, মানুষের স্বাধীনতাকে, ব্যক্তিত্বকে, মর্যাদাকে ও মূল্যবোধকে। তাঁর মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিলে ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে না। কারণ ঈশ্বর দ্বারা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ হবে। সার্ত্রে বলেন, মানুষ তার স্বাধীন সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষ কোনো সার্বিক সত্তা, মূল্যবোধ, যথার্থ স্বভাব নিয়ে জন্মায় না, এটি নিজেকেই তৈরি করতে হয়। নিজেকে যথার্থভাবে তৈরি করতে গিয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো, মনস্তাপ (Anguish), হতাশা, (Despair), মৃত্যুর ভয় (Fear of Death), কৃত্রিম বিশ্বাস (Bad Faith), ও দশাগ্রস্ততা (Facticity) ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সার্ত্রে বলেন, মানবজীবন মনস্তত্তাপের ওপর নির্ভরশীল। কেননা ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে কি না তা পূর্বেই না জানার কারণে ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাপ বিরাজ করে। মনস্তাপের পর ব্যক্তির হাতাশা নিয়ে সার্ত্রের বক্তব্য হলো, মানুষের সকল কর্মের যোগফল হলো তার অস্তিত্ব। মানুষকে কর্মের সম্ভাব্য ফলাফল বিচার করেই এগোতে হয় বলে তার মধ্যে হতাশা কাজ করে। তবে সম্ভাব্য স্তর থেকে বাস্তব স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমে হতাশা তিরোহিত হয়। আর মৃত্যু হচ্ছে মানবজীবনের অনিবার্য অংশ। সংগীতের শেষ সুর মূর্ছনার মতো মৃত্যু তার জীবনকে অর্থময় করে। এটি সার্ত্রে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, ব্যক্তির কাছে মৃত্যুর কোনো মানে নেই। মৃত্যু হচ্ছে সব সম্ভাবনার অবসান। তবে মৃত্যু অপরের কাছে অর্থ আছে। তাই একজনকে হত্যা করে তার স্থান দখল করে নেয় অপরজন। কৃত্রিম বিশ্বাস সম্পর্কে সার্ত্রে বলেন, ব্যক্তি নিজের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই এটি প্রকাশিত হয়। নিজের ভিতরে সত্যকে লুকিয়ে রাখে। অন্যদেরকে বুঝতে দেয় না। এতে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে অন্তবর্তী সত্তার কাছে। সবশেষে দশাগ্রস্ততা প্রসঙ্গে সার্ত্রের বক্তব্য হলো, ব্যক্তি গতানুগতিক অবস্থার বিবরণ। যাকে সার্ত্রে আঁ-সোঁয়া বলেছেন। সার্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ এবং অস্তিত্ববাদের বাইবেল হিসেবে

খ্যাত 'সত্তা ও শূন্যতা' (Being and Nothingness) নামক গ্রন্থে তিনি সত্তার দুইটি দিকের কথা বলেন, একটি আঁ-সোঁয়া (Being in itself) ও অপরটি পুর-সোঁয়া (Being for itself) । সার্ত্রের মতে, আঁ-সোঁয়া ও পুর-সোঁয়া বলতে বুঝাতে চান একে অপরের বিপরীতধর্মী সত্তা। অর্থাৎ আঁ-সোঁয়া অচেতন ও অপরিবর্তনশীল সত্তা আর পুর-সোঁয়া হচ্ছে চেতন ও গতিশীল সত্তা। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর আরেক বিখ্যাত গ্রন্থে 'Critique of Dialectic Reason' এ বিষয়ীগত সত্তা ও বিষয়গত সত্তা কীভাবে বৈপরীত্য তার আলোচনা করতে গিয়ে আঁ-সোঁয়াকে বলেন বিষয়গত সত্তা আর পুর-সোঁয়াকে বলেন বিষয়ীগত সত্তা। যা মানবজীবনে আমি ও অপর ব্যক্তির মধ্যে (যে বিভেদ মার্কসীয় দর্শনের পুঁজিবাদী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিদ্যমান) প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র গুণাবলি ও প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন উক্ত গ্রন্থে ।

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী ধারা বিকাশের পিছনে সর্বপ্রথম গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের অবদানকে কিছুটা স্বীকার করে নিতে হয়। তিনি সর্বপ্রথম এথেন্সের জনগণের অজ্ঞতা দূর করতে 'নিজেকে জানো'-এ ধরনের উক্তি প্রচার করেন; তবে নিজের অজ্ঞতা জানা ও তা দূর করার জন্য 'কথোপকথন পদ্ধতির' আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষকে অন্তর্মুখী চেতনায় নিয়ে এসে এবং নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার জন্য চেষ্টা করেন। GRbv Ronald Grimsley তাঁর 'Existentialist Thought' গ্রন্থে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন "…Socrates may be considered as the first existential thinker of ancient Greece set the ethical reference of thought against the scientific bias of the Ionian school which sought to understand nature rather than man. "[1] তাঁর এ ধরনের উক্তি প্রমাণ করে যে, সক্রেটিসের উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে যে অন্তর্মুখী (introspective) বোধের সৃষ্টি করে, তার মধ্যেই অস্তিত্ববাদের বীজ নিহিত ছিল। তবে নিজেকে কেন, কীভাবে জানতে হবে তার কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করেননি, এবং তিনি মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর যথার্থ না হলে পরে একই বিষয়ে আবার প্রশ্ন করতেন। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না যথার্থ উত্তর খুঁজে পেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করতেই থাকতেন। এজন্য তাঁর দর্শন মূল্যায়ন করতে গিয়ে William Barrett তাঁর '*Irrational man*' গ্রন্থে বলেন, "As the ancient Socrates played the gadfly for his fellow Athenians stinging them into awareness of their own ignorance…"[2] তাঁর এই উক্তির মধ্যে মানুষের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপাদান রয়েছে। কিন্তু এতে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে

---

1 Ronald Grimsley, *Existentialist Thought*, Cardiff, University of Wales Press, 1955, p.1.

2 William Barrett, *Irrational Man,* Heinemann, London, Melbourne, 1961, p.140.

কোনো গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের সার্বিক বিষয়গুলো যেমন, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, আদর্শ ইত্যাদি গুরুত্ব দেওয়ায় তাকে অস্তিত্ববাদী বলা যায় না। তবে তাঁর 'নিজেকে জানো' এ উক্তির মাধ্যমে অন্তর্মুখী চেতনা জাগ্রত করে ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। সক্রেটিসের 'কথোপকথন পদ্ধতি'-কে বিশ্লেষণ করে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড বলেন, "... So he told himself, in raising difficulties for the easy conscience of an age that was smug in the conviction of its own material progress and intellectual enlightenment. "[3] এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সক্রেটিসের কার্যকলাপের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চার আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড রায় কার্যকর করার মুহূর্তে ব্যক্তির অস্তিত্ব কীরূপ হবে তার ইঙ্গিত প্রদান করেন এইভাবে, " সবচেয়ে সহজতম মহৎ উপায় হচ্ছে নিজেদের উন্নতি করা, অন্যকে আঘাত করা নয়।"[৪] সক্রেটিসের পরে প্লেটো মানুষের একটি সারধর্ম (Essence) নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি বলেন, সারধর্মই ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই-ই যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে, জগতে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও বস্তুগুলো প্রত্যক্ষ করি, সেগুলো নশ্বর। একমাত্র সারধর্ম চিরন্তন ও ধ্বংসহীন, যা মানুষের অস্তিত্বকে তৈরি করতে সহায়তা করে। সারধর্ম মানুষের প্রকৃত রূপ এবং প্রাণিধর্ম থাকলেও, সারধর্ম বা সারসত্তাকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মানুষের সার্থকতা।

প্লেটোর চিন্তার প্রতিফলন আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দেকার্ত ও হেগেলের মধ্যেও পাওয়া যায়। দেকার্ত যুক্তির আলোকে কতকগুলো সহজাত ধারণার কথা বলেন, যেগুলোর দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। হেগেল শুধু মানবজীবনে নয়, সমগ্র জগতেই বুদ্ধির বিকাশ লক্ষ করেছিলেন। এরকম আকারগতভাবে বুদ্ধির বিকাশকে দার্শনিক তত্ত্বগুলোর কাছে স্বভাবতই ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করা হয়। এ থেকে প্রশ্ন ওঠে যে, যুক্তি, বুদ্ধি ও সারধর্মই যদি ব্যক্তির অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে, তাহলে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে যুক্তিসংগত বলা যায় না। কারণ ব্যক্তির সারধর্ম থেকে তার অস্তিত্ব যুক্তিগতভাবে নিঃসৃত হয় না। যেমন, মধ্যযুগের খ্রিস্টান দার্শনিকদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটি প্রধান কাজ ছিল। এজন্য তারা যুক্তি দেখান ঈশ্বরের সারধর্ম এমন যে, ঈশ্বর না থেকে পারে না। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বরের সারধর্মই তার অস্তিত্বকে যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারিত করেছে। রেনে দেকার্ত এরূপ বক্তব্যই প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর সব ধরনের দোষের ঊর্ধ্বে। তিনি বলেন, যদি ধরে নেওয়া হয় ঈশ্বর নেই, তাহলে তার এ না থাকাটা ঈশ্বরের একটি দোষ বলে বিবেচ্য, এতে করে ঈশ্বর সব দোষের ঊর্ধ্বে থাকতে পারছেন না। সুতরাং ঈশ্বর আছেন। কিন্তু মানুষের বেলায় একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ মানুষ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এর পিছনে যুক্তি হলো ঈশ্বরের মতো মানুষের সারধর্ম নেই। অতএব সারধর্মের কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি সর্বজনীন প্রত্যয়ে পরিণত

---

3 Ibid., p. 40.

4 বার্ট্রান্ড রাসেল, cvðvZ¨ 'k‡bi BwZnvm, অনুবাদ, ডক্টর প্রদীপ রায়, ঢাকা, অবসর প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৮৭।

হয়েছে। এজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব যথার্থ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মনে করেন, মানুষের অস্তিত্ব যেহেতু সারধর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয় না সেহেতু মানুষের অস্তিত্ব সর্বজনীন নয় বলে যথার্থ বলা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিবাদী দার্শনিক রেনে দেকার্ত মানুষের তিনটি সারধর্ম আবিষ্কার করেন, যা সব মানুষের মধ্যে বিরাজমান, "...Some appear to me to be innate, others adventitious, and others to be made by myself (factitious); for, as I have the power of conceiving what is called a thing, or a truth, or a thought, it seems to me that I hold this power from no other source than my own nature. "[5] এখানে দেকার্ত যে তিনটি সর্বজনীন প্রত্যয়ের কথা বলেছেন, তা মানুষের বোধশক্তির সাথে সম্পর্কিত। এ তিনটি ধারণার মধ্যে সহজাত ধারণার প্রয়োগই অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য সহায়ক। কেননা জাঁ-পল সার্ত্রসহ সব অস্তিত্ববাদীরা এ বিষয়ে একমত যে, ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে একেবারে শূন্য। ব্যক্তি তার যথার্থ অস্তিত্ব নিজেই নির্মাণ করে। আর দেকার্তের এ সর্বজনীন প্রত্যয় কাজে লাগায়। এ ধরনের প্রত্যয়ের মধ্যে সহজাত ধারণা বা অন্তর ধারণা অন্যতম। এ ধারণা সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে নিহিত থাকে। এজন্য এ ধারণাগুলো সর্বজনীন। সর্বজনীন সত্তা হিসেবে সহজাত ধারণা স্থায়ীভাবে সকল ব্যক্তিমানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তা দিয়ে ব্যক্তি তার চেতনাকে কোনো বস্তু বা বিষয়ের দিকে ধাবিত করতে পারে। এজন্য চেতনা মাত্রই বিষয়মুখী ও সর্বব্যাপী সত্তা।

এ বিষয়মুখী চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং মানবজীবনে কোনো বিষয় ও বস্তুর মধ্যে কোন ধরনের সংবেদনশীল ও বিস্ময়কর শক্তি রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে পারে। সার্ত্রে বিষয়মুখী চেতনার মাধ্যমে হুসার্লের অবভাসিক দর্শনের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য অস্তিত্ববাদী দর্শন বিকাশের পথকে মসৃণ করে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায় হুসার্লের অবভাসবিজ্ঞান। এ অবভাসের স্বরূপ ও অর্থ বুঝানোর জন্য তিনি তাঁর 'Cartesian Meditations' গ্রন্থে বলেন, "…The world is for me absolutely nothing else but the world existing for and accepted by me in such a conscious cogito…"[6] এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তির নিজস্ব চৈতন্য শক্তি দ্বারা গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে জগতের কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকা না থাকা নির্ভর করে। আর এজন্য চৈতন্য শক্তির মাধ্যমে জগতের সবকিছু অস্তিত্বশীল হলেও বস্তুর সারার্থ আবিষ্কার করার জন্য এবং চেতনাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য অ্যাডমণ্ড হুসার্ল 'বন্ধকীকরণ' পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। কেননা এ পদ্ধতি দ্বারা মানুষের কৌতূহলী চেতনাকে সুনির্দিষ্ট করে এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় চেতনাকে অগ্রাহ্য করে-

---

5 Rene Descartes, *A Discourse On Method*, London, J. M. Dent & Sons Ltd. p. 98.

6 Edmund Husserl, *Cartesian Meditations*, trans. by Dorion Cairns, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960, p. 20.

কোনো বিষয়, ঘটনা, ব্যক্তি ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। এ অবভাসবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হন হাইডেগার। তবে হাইডেগার হুসার্লের এ তত্ত্বকে 'বন্ধকীকরণ' পদ্ধতি মাধ্যমে না জেনে অবভাসকে জানার জন্য সেই বস্তুর প্রয়োগের দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যেমন, একটি কম্পিউটারকে ব্যবহারিক দিক জানার পরেই ঐ বস্তুর প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। হাইডেগার এ ধরনের বক্তব্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার জগৎস্থিত সত্তা 'ডাজায়েন'কে তিনি নিজ গতিপথ নির্ধারণকারী ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ সত্তার সাথে যেসব বাস্তব সমস্যা নিহিত যেমন, দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি, ভয়, মনস্তাপ, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও হতাশা ইত্যাদি এসব অন্তর অনুভূতি যা মানুষের অস্তিত্ব তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য মানুষকে 'মৃত্যু' নামক এক অবভাসিক চেতনা দ্বারা উদ্ভাসিত হতে হবে, যা নিয়ে আসে মানুষের মধ্যে একাকিত্ববোধ এবং এ বোধের মানুষ তার নিজস্ব বাস্তব স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। সে ভাবে মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা কিছু নেই। এ সত্যকে ধারণ করলে মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করতে পারে। হাইডেগারের অস্তিত্ববাদ ও হুসার্লের অবভাসবিজ্ঞানের ভিন্নতা হচ্ছে অস্তিত্ববাদ দর্শনে অস্তিত্ব বলতে মূর্ত ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে আর অবভাস বলতে এখানে কোন ঘটনার অন্তরালে রহস্যকে কিংবা কোনো বস্তুর সারার্থকে বুঝানো হয়েছে। তাই হাইডেগারের অস্তিত্ববাদের লক্ষ্যের সাথে হুসার্লের অবভাসবিজ্ঞানের কিছুটা ভিন্নতা সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদী সার্ত্রের ব্যক্তি অন্তর্মুখী গুণ ও হুসার্লের ঘটনার সারার্থ আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্যক্তি ও ঘটনার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায়। বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যে অস্তিত্ব বা চেতনা নিহিত থাকে তা বাদ দিয়ে শুধু মূর্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট গুণাবলি রয়েছে, তা অবভাসিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে সার্ত্রে ধারণা লাভ করেন।

অবভাসবিজ্ঞান প্রসঙ্গে Christopher Macann বলেন, " The idea of phenomenology is one of those texts (Like Cartesian Meditions) which is mostly introductory but which does also include one new and significant contribution-in this case and preliminary conception of the immanent-transcendent distinction and a second and conclusive conception of this same distinction. "[7] এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে তার মাধ্যমে ব্যক্তি বা বিষয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা চিহ্নিত করা যায়। ব্যক্তি ও বস্তুর সারার্থ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা হচ্ছে অবভাসবিজ্ঞানের কাজ। হুসার্লের অবভাসবিজ্ঞান স্বাতন্ত্র্য সত্তার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তবর্তী হওয়া, আত্মাতিক্রমণ হওয়া, স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করে। কিন্তু বস্তু ও অবভাসকে জানার জন্য যা জানতে হবে তা

---

7 Christopher Macann, *Four Phenomenological Philosophers*, London and New York, Routledge, 2002, p. 17.

বস্তুর মৌল উপাদান। যেমন, একটি টেবিলকে জানার জন্য তার কাঠিন্য, ওজন ও আকার ইত্যাদির মাধ্যমে জানতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি শুধু বস্তুকে জানি তাহলে বস্তু হবে অচিন্তাশীল আর বস্তুকে যদি প্রয়োগের মাধ্যমে জানি তাহলে বস্তুটি হবে চিন্তাশীল।

ব্যক্তির অন্তর্মুখী চিন্তার নানাবিধ প্রয়োগের মাধ্যমে আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবী উন্নয়নের এক আকাশ ছোঁয়া সভ্যতা দেখতে পেল। এরপর থেকে ব্যক্তি মানুষ তার ব্যক্তি সত্তাকে ক্রমশ হারাতে শুরু করল। যে মানুষ প্রযুক্তি ও বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাজ করেছিল, সেই প্রযুক্তি মানুষকে করলো দাস আর যন্ত্র ব্যক্তি মানুষের ওপর প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। অর্থাৎ প্রযুক্তি ও যন্ত্র হলো প্রভাব বিস্তারকারী সত্তা (Subjectivity), আর ব্যক্তি হলো প্রযুক্তি ও যন্ত্রের প্রভাব গ্রহণকারী সত্তা (Objectivity)। এভাবে ব্যক্তি মানুষ হয়ে পড়ল একজন যন্ত্রবাহক, রাষ্ট্রের একজন নাগরিক, করদাতা, ভোটার ও শ্রমিক। এ প্রসঙ্গে Dermot Moran বলেন, "Most nineteenth-century psychology proceeded by introspection and offered training in this 'armchair' self-observation. "[8] এখানে মানুষকে নিজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেননা বস্তু জগতের আরাম করে বসার জন্য কেদারা যেমন মানুষের দেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়তা করে। অনুরূপভাবে, ব্যক্তির নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ইস্ট ও অনিস্ট নির্বাচন, নিজের সম্পর্কে, অপর ব্যক্তি ও বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে; তার জীবন ধারাকে সংকটমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। তবে অনেক সময় ব্যক্তি মানুষ তার স্বাধীন সত্তাকে ভুলে প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইউরোপের মুক্তবাজার অর্থনীতির ও শিল্পকারখানা নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রতি তীব্র নির্ভরতা দেখে ডেনমার্কের একজন ভাবুক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড উপলব্ধি করলেন যে, ব্যক্তি মানুষের সক্রিয় স্বাধীন কর্তাসত্তাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়? এর জন্য এমন এক সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে যার দ্বারা ব্যক্তি মানুষ তার নিজ সত্তায় ফিরে যেতে পারে এবং যন্ত্রকে করতে পারে দাস। তাই উনিশ শতকের প্রথম দিকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৩) বলেন, "... the subjective thinker is as an existing individual essentially interested in his own thinking, existing as he does in his thought. His thinking has therefore different type of reflection, namely the reflection of inwardness, of possession, by virtue of which it belongs to the thinking subject and to no one else. "[9]

---

8 Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology*, London, Routledge, 2000, p. 41.

9 Maurice Friedman, *The Worlds of Existentialism A Critical Reader,* New York, Random House, 1964. p. 114.

তার এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব জানার যুক্তি বা বুদ্ধিকে গুরুত্ব না দিয়ে, তিনি ব্যক্তির ভিতরকার চেতনা বা অন্তর্মুখিতা (inwardness), চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। এ দর্শন ভাববাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, বুদ্ধিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এ দর্শনের আন্দোলনের ধারার সাথে যেসব দার্শনিক যুক্ত তাঁরা হলেন কার্ল ইয়াসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) ও গ্যাবরিয়েল মারসের্ল (১৮৮৯-১৯৭৩) । আর যারা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব তৈরিতে ঈশ্বরের ভূমিকার চেয়ে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার ভূমিকাকে বেশি প্রাধান্য দেন। এঁদের মধ্যে আছেন ফ্রেডরিক নীৎশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৮৭৬) এবং জাঁ-পল্ সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ।

ব্যক্তি অস্তিত্ব গঠনে ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে পার্থক্য থাকলেও অস্তিত্ববাদীদের দুই দলের বক্তব্যের মধ্যে যে মিল লক্ষ করা যায় তা হলো, Ôe¨w³i A¯ÍZ mvimËvi ceMvgxÕ| এ উক্তি দ্বারা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা সব ধরনের সার্বিক সারসত্তাকে গুরুত্ব প্রদান না করে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ব্যক্তির অস্তিত্ব নিজস্ব কর্ম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তৈরি, এতে কোনো সার্বিক সারসত্তার ভূমিকা নেই। তাই বলা যায়, ব্যক্তির কর্ম, ভাবাবেগ বা ইচ্ছাশক্তি যেদিকে ধাবিত হয়, সেদিকে ব্যক্তির অস্তিত্ব তৈরি হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির যদি লেখক হওয়ার প্রতি ভাবাবেগ থাকে তাহলে ধীরে ধীরে কোনো বিষয় সম্পর্কে লিখতে লিখতে লেখক হয়ে ওঠে। তাছাড়া ব্যক্তি স্বাধীন বিধায় সে বুঝতে পারে তার কোন দিকে কাজ করার প্রবণতা আছে। কেননা ব্যক্তির নিজস্ব নির্বাচন ও প্রবণতা দ্বারাই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। নির্বাচিত কর্ম ব্যক্তির অস্তিত্ব যা অস্তিত্ববাদীরা সারসত্তা পূর্বগামী বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি সচেতনভাবে কোনোকিছু হওয়ার জন্য কোনো কাজকে নির্বাচন করে এবং সে কাজের বাস্তবায়ন ঘটানোর মাধ্যমে যে স্বতন্ত্র গুণ অর্জন করে; সেই স্বতন্ত্র গুণ হচ্ছে ব্যক্তির অস্তিত্ব।

যুক্তিবাদীরা বলেছেন, মানবজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ জন্মসূত্রে যে সারসত্তা লাভ করে, সেই সারসত্তা দ্বারা তার জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু একথা সব অস্তিত্ববাদী দার্শনিক অস্বীকার করেন। মানবজীবন সম্পর্কে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড কতকগুলো স্তরের কথা বলেন। মানবজীবনে ব্যক্তি মানুষের প্রথম স্তর হচ্ছে ভোগীয় জীবন। যে জীবন যথার্থ জীবন নয়। কেননা এ জীবনের পরিণতি হতাশা ও অস্থিরতা। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বেছে নেয় মানবজীবনের দ্বিতীয় স্তর নৈতিক জীবন। নৈতিক জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার বহন করতে করতে এক সময় ব্যক্তি মানুষের এ জীবনের প্রতি অনাসক্তি আসে, তাই এ নৈতিক জীবন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য গ্রহণ করে মানবজীবনের সর্বশেষ স্তর ধর্মীয় জীবন। যে জীবনে ব্যক্তি শুধু নিজের মুক্তির জন্য তার সমস্ত অস্তিত্ব ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। আর এ ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃত খ্রিস্টান হয়। আর এ প্রকৃত খ্রিস্টান হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি

যথার্থ সারসত্তার অধিকারী হয়। অনুরূপভাবে সার্ত্রে দর্শনে মানুষ প্রথমে আঁ-সোঁয়া মতো শূন্য অস্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পরে ব্যক্তি স্বাধীন চেতনা দ্বারা পুর-সোঁয়া বা যথার্থ অস্তিত্বের স্বরূপ সৃষ্টি করে, যথার্থ জীবন লাভ করে। নিম্নে ডায়াগ্রাম আকারে সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ও সার্ত্রের ব্যক্তি অস্তিত্ব নির্মাণের ধারাবাহিকতা দেখানো হলো :

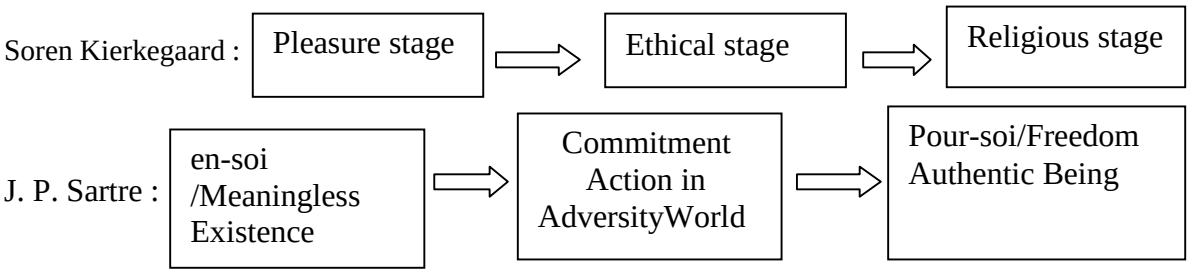

অস্তিত্ববাদী দর্শনে কার্ল ইয়াসপার্সেরও সার্ত্রের মতো একই সুর প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, মানুষ প্রথমে অযথার্থ অস্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পরে তাকে যথার্থ অস্তিত্ব অর্জন করতে হয়। এ যথার্থ অস্তিত্ব অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই বর্তমান অবস্থানকে অতিক্রম করতে হয়। যাকে বলা হয় অতিবর্তিতা (Transcendence)। যেমন, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড তাঁর সুন্দরী প্রেমিকা রেজিনাকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য ধর্মীয় স্তরে পদার্পণ করেন। অর্থাৎ তিনি ভোগীয় জীবন থেকে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেন। এ ধরনের উত্তরণকে বলে অতিবর্তিতা । তাই অস্তিত্ব নিমার্ণে শাশ্বত সত্যগুলো নিজ জীবনে অনুশীলন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে Soren Kierkegaard যে উক্তি করেন তা হলো, "...When the question of the truth is raised subjectivity reflection is directed subjectivity to the nature of the individual's relationship; if only the mode of this relationship is in the truth, the individual is the truth even if he should happen to be thus related to what is not true."[10] অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি বলেন, সত্য সম্পর্কে জানার জন্য আত্মোপলব্ধি হলো সর্বোচ্চ স্তর, যার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তা তিনটি জীবন পৃথক পৃথকভাবে উপলব্ধি করে, তাঁর মধ্যে কোন জীবনটা শ্রেষ্ঠ তা নির্বাচন করেন। এ স্বনির্বাচিত সর্বোচ্চ মানবজীবনে ব্যক্তি মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে জীবনের প্রতিটি স্তর উপলব্ধি করে। যদিও এ ধরনের জীবন উপলব্ধির কথা গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। জীবন উপলব্ধির অর্থ হলো ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এক ধরনের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করা। যেমন, এ জীবনের অর্থ কী, যথার্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার কী কী প্রয়োজন এবং প্রয়োজন নয়, কী কাজ করা উচিত এবং উচিত নয়? ইত্যাদি

---

10 Soren Kierkegaard, *Concluding Unscientific Postscript*, trans. by David F. Swenson, Princeton, Princeton University Press, 1944, p. 178.

প্রশ্নের মধ্যে ব্যক্তির এক ধরনের আত্মচিন্তার উন্মেষ ঘটে। এ চিন্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সঠিক পথ খুঁজে পায়। যা প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরিতে সহায়তা করতে পারে এবং সবকিছু হারিয়েও একাকিত্ব জীবনযাপন করতে পারে।

ফ্রেডরিক নীৎশে কিয়ের্কেগার্ডের ধর্মীয় অস্তিত্বকে বিরোধিতা করে বলেন, ঈশ্বর হচ্ছে মৃত, মানুষকেই ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কিয়ের্কেগার্ডের বস্তুগত সত্যের ধারণাকে আমাদের বুদ্ধির শত্রু বলে আখ্যায়িত করেন। আর শ্রেষ্ঠ মানব হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, রাজনীতি ও দাসত্ব নৈতিকতাকে বাধা মনে করেন। এসব বাধা ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে অতিক্রম করে ব্যক্তি অতিমানব হবে। অতিমানব হওয়ার জন্য আবেগ, উৎকণ্ঠা এবং ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর জোর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "চৈতন্যের চাইতে অস্তিত্বকে, যুক্তির চাইতে ইচ্ছাশক্তিকে, নৈর্ব্যক্তিক এবং বিমূর্ত ধারণার চাইতে ব্যক্তিসাপেক্ষিক এবং সংরক্ত অনুভূতিকে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার চাইতে আদিম উদ্দাম প্রাণ প্রবাহকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিলেন।" ব্যক্তির আদিম উদ্দাম প্রাণ দিয়ে নিজের সত্তার বিকাশ করতে হয়। এ বিকশিত রূপ হবে অতিমানব । আর এ অতিমানবই হচ্ছে সার্ত্রের দর্শনে যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ।

ফ্রেডরিক নীৎশের সময়কালে মানুষের সার্বিক সত্তা হিসেবে ক্ষমতার ওপর গুরুত্বারোপ করার কারণে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ইউরোপের সভ্যতা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছিল এবং সেই সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হলে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নীৎশে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন। ব্যক্তির অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য ফ্রেডরিক নীৎশে বলেন, "The problem was to overcome scepticism, pessimism, and nihilism; after the undermining of all certainty in respect of knowledge, the lapse of all impulse and goal in respect of will, the extinction of all emotion, to recover intellectual assurance, emotional response and commanding aims, that was for him the problem of philosophy-joyful wisdom. "[11]

তাঁর এ বক্তব্য থেকে একটি সত্য বের হয়ে আসে তা হলো, ব্যক্তি তার সমস্ত আবেগের মৃত্যু ঘটিয়ে এবং কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যক্তিকে হয়ে উঠতে হবে নির্ভীক ও শক্তিমান; যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমস্ত সংকট অতিক্রম করে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠবে। তার এ নির্ভীক ও অতিমানব হওয়া থেকে যে ইতিবাচক দর্শন জন্ম নেয় তা হলো অস্তিত্ববাদ। কিন্তু এ দর্শনের প্রভাবে কিছু ব্যক্তি মানুষ নিজেকে অতিমানব হিসেবে প্রমাণ করার জন্য জন্ম দেয় ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ। এ ধরনের দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষ ক্ষমতা

---

11 H. J. Blackham, *Six Existentialist Thinkers,* London, Routledge and Kegan Paul, 1952, p. 24.

নামক বিমূর্ত শক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের জনগণের অস্তিত্বকে হুমকির দিকে ফেলে দেয়। ইউরোপে যখন শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা তখন কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষকে আরও ভয়াবহ সংকটের দিকে নিয়ে ঠেলে দেয়। যুদ্ধ যে মানুষের জানমালের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করতে পারে সমগ্র বিশ্ববাসী তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কাছে নিজের অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভয়াবহতা ও বিভীষিকার কালোমূর্তি আজও সভ্য মানুষের দেহে শিহরণ জাগায়। সার্ত্রে, হাইডেগার প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ করেছেন কীভাবে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছে শত শত মানুষ অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও পদদলিত হয়েছে। কীভাবে বিষাক্ত গ্যাস লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান নামক অ্যাটম বোমা নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুর জীবন নিশ্চিহ্ন করেছে। মহাযুদ্ধের এসব বিভীষিকাময় তাণ্ডবলীলা মানবজীবনে এমন বিপর্যয় ডেকে আনে, যার ফলে ব্যক্তিমানুষ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি সন্দিহান হয়ে ওঠে। এসব যুদ্ধবিগ্রহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সার্ত্রে অস্তিত্ববাদ দর্শনের বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, ব্যক্তি সবকিছু হারিয়েও একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গভাবে নিজের অস্তিত্ব নির্মাণ করতে পারে একেবারে শূন্য অবস্থান থেকে। এভাবে মানসিক শক্তি তৈরি করে সার্ত্রে প্রত্যেক যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্যক্তিকে নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখান। যদিও যুদ্ধ মানবজীবনকে দুঃখময় ও যন্ত্রণাময় করে তোলে, তবুও এ অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে নিজেকেই নতুনরূপে সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে হবে। বর্তমানেও মানবজীবনে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, পরিবারের সাথে পরিবারের, সমাজের সাথে সমাজের, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের যুদ্ধ ও সংঘর্ষের নানাবিধ কারণ রয়েছে। "বর্তমান সংঘাতময় ও মানবিক দিক দিয়ে দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীতে বড় সমস্যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার, মানব সম্পদের অপচয়, আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার অপব্যবহার, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয়, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, রাজনৈতিক কোন্দল, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক সংকট, মানুষের অমানবিকীকরণ ও মানুষকে পণ্যে পরিণতকরণ, ক্ষুদ্র ভাষা, মতাদর্শিক, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের ওপর আক্রমণ ইত্যাদি।"[১২]

সার্ত্রে মনে করেন, মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ একা, সে অন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি হচ্ছে অস্তিত্ববাদের প্রথম সূত্র। এ প্রসঙ্গে Maurice Friedman বলেন, "Man is nothing else but he makes of himself. Such is the first principle of existentialism. It is also

12 আনিসুজ্জামান, AvPvh wb¤v‡Ki ‘kb I wekkwš Í, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৮: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ. ৯৭।

what is called subjectivity, the name we are labeled with when charges are brought against us. "[13]

অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তি মানুষের সারধর্ম প্রতিবিম্ব এ উক্তিকে অগ্রাহ্য করে মানুষের ভবিষ্যৎ বা স্বতন্ত্র গুণাবলি তৈরির জন্য স্বাধীন সত্তাকে প্রাধান্য দেন এবং এর জন্য প্রয়োজন অর্থপূর্ণ কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন,

> কোনোকিছুর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধিজীবী মাত্রই অনুভব করেন। কিন্তু আমি অনুভব করেছিলাম সমাজের জন্য একটি ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জরুরি প্রয়োজন আছে। নিজের চিন্তা ও মনন শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীটাকে একাই বদলে ফেলা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেছেন। তাই যখন তাঁর মনে হলো কিছু সামাজিক শক্তি এগিয়ে যেতে চাইছে, তখন তিনি ভাবলেন যে তাঁর স্থান তাদের মধ্যেই। কারণ সার্ত্রে মনে করেন যে, সামাজিক বুনুতিতে ঘা দিতে গেলে বা তাকে নাড়িয়ে দিতে গেলে একক চেষ্টা আদৌ যথেষ্ট নয় সে কাজের জন্য চাই দল যার মধ্য দিয়ে চলবে সংগ্রাম।[১৪]

এ সংগ্রাম প্রথমত ব্যক্তি নিজে করবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, তারপর সে বিকশিত রূপ দিয়ে সম্মিলিতভাবে সমাজের অসংগতি দূর করবে, যার মাধ্যমে সমাজের চেহারা পরিবর্তন হবে। তবে সমাজ যেহেতু অনেক মানুষের সংমিশ্রণ সেহেতু সমাজের চেহারা পরিবর্তন করতে হলে সম্মিলিত মানুষের উদ্যম একান্ত প্রয়োজন। কেননা সমাজে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের বসবাস। তাদের সাথে ব্যক্তি মানুষ যেমন সম্পর্ক রক্ষা করবে ঠিক তেমনি তাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় করলে তা সবাই মিলে প্রতিহত করবে। তাহলেই সমাজ সুন্দর ও সৃজনী হবে, এমন সমাজই সার্ত্রে তাঁর নিজ জীবনে প্রত্যাশা করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, মানুষের অস্তিত্ব তৈরি হয় বিভিন্নভাবে, যে মানুষ বংশগত কিছু গুণ নিয়ে জন্ম নেয় তার অস্তিত্ব একরকম। আবার যে মানুষ নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা কিছু গুণাবলি অর্জন করে তার অস্তিত্ব হয় আরেক রকম। তবে এর মধ্যে নিজস্ব চেষ্টা দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্য গুণাবলি সৃষ্টি হয় সেটিই যথার্থ অস্তিত্ব। তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ও ভাববাদী দার্শনিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে, কোনো ব্যক্তি পূর্বনির্ধারিত অস্তিত্ব (স্বভাব ও মূল্যবোধ) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং সে স্বাধীনভাবে তার পছন্দ অনুযায়ী তার ভাগ্য সৃষ্টি করে বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অবস্থান করে স্বাতন্ত্র্য গুণাবলির অনুশীলন দ্বারা। কিন্তু সার্ত্রে দার্শনিক জন লকের মতো বলেন, ব্যক্তিমানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থাকে স্বভাবশূন্য ও মূল্যবোধহীন (অলিখিত সাদা কাগজের মতো)। এ স্বভাব শূন্যকে বা জন লকের অলিখিত সাদা

---

13 Maurice Friedman, op. cit., p. 136.

14 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, g‡LvgjL, সম্পাদনা, উৎপল ভট্টাচার্য, কলকাতা, কবিতার্থ সরণি, ২০১২, পৃ. ৬৩।

কাগজে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি সত্যিকার স্বভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যথার্থ স্বভাব সৃষ্টির জন্য আরও যা প্রয়োজন তা হলো ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যের প্রভাব, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন বা চাপ থেকে মুক্ত, জাগতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এলোমেলো উদ্দীপক পরিত্যাগ প্রভৃতি। নির্মল ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ও একাগ্র চিত্তে কাজ করলে ব্যক্তি মানুষের নিজ ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে নিজস্ব চিন্তার সমন্বয় ঘটে বিধায় ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি ঘটে। যারা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক তারা আরও যুক্তি দেখান যে, সারধর্ম যদি আগে থেকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রোথিত হয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতো তাহলে মানুষের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকত না, বরং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতো; এমনকি ব্যক্তি মানুষ প্রকৃতির নিয়মে জীবের মতো জীবনযাপন করতো। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিরীক্ষণ করি যে, মানুষের স্বাধীনতা আছে বিধায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কর্মের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ দিক প্রত্যক্ষ করে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে নিজস্ব অস্তিত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। কেননা, অস্তিত্ববাদীদের বক্তব্য ছিল, দর্শনের কাজ জীবনকে উপলব্ধি করা এবং সে জীবন কোনো ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামগ্রিক সত্তা নয়; অস্তিত্বকে উপলব্ধি করাই জীবনের সবচেয়ে চরম সত্য। এ চরম সত্য বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি সামষ্টিক বা জনতা থেকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব প্রকাশ করবে। এ প্রসঙ্গে Soren Kierkegaard তাঁর 'The Point of View' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "The crowd, in fact, is composed of individuals; it must therefore be in every man's power to become what he is, an individual. From becoming an individual no more, no one at all, is excluded except he who excludes himself by becoming a crowd. "[15] ব্যক্তিমানুষ জনতা থেকে পৃথক হয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কীভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে, তার দিকনির্দেশনাই হলো অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কাজ। অস্তিত্ববাদীদের মতে, শুধু কিয়ের্কেগার্ড নয়, সব অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতেই দর্শন হলো ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব উপলব্ধি যে সমস্যা এবং সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তিকে জীবনযাপন করতে হয় তার প্রকাশ। অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎস আলোচনায় প্রথমে যে প্রশ্ন ওঠে তা হলো, ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বলতে তাঁরা কী বুঝান এবং কীভাবে এ অস্তিত্বকে নির্মাণ করতে হয় এবং কীভাবে এ অস্তিত্বকে জানা যায়? এ সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ড যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো,

> "The talk asks you, then, whether you live in such a way that you are conscious of being an 'individual' … for in the outside world, the crowd is busy making a noise. The one makes a noise because he heads the crowd, the

---

[15] Soren Kierkegaard, *The point of View*. trans. by Walter Lowrie. London and New York, Oxford University Press, 1939, p. 121.

> many because they are members of the crowd. But the all-knowing one, who in spite of anyone is able to observe it all, does not desire the crowd. He desires the individual; He will deal with only the individual, quite unconcerned as to whether the Individual be of high or low station, whether he be distinguished or wretched. "[16]

কিয়েৰ্কেগার্ড দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি' নিয়ে শুরু করেন। কিন্তু যে প্রসঙ্গে দেকার্ত এ উক্তি করেন তা হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও তর্কাতীত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বলে মনে হয়, কেবল সেসব ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাকে সীমিত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি অন্যদের মতামতকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করবেন না বলে জানান। তিনি বলেন, "একটি ধারণা বা বিশ্বাসের পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই, কিন্তু তবু কেবল ইচ্ছার চাপে যদি আমরা একে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে যাই, তাহলে আমরা সত্যের পথ থেকে যত দূরে সরে পড়ব, অন্য কোনোকিছু আমাদের সত্য থেকে তার চেয়ে বেশি দূরে ঠেলে দিতে পারবে না।"[১৭] দৈনন্দিন জীবনে সত্যের আবিষ্কার করতে গিয়ে দেকার্ত যেসব নিয়ম অনুশীলন করবে বলে স্থির করেছিলেন, সেগুলো তিনি উল্লেখ করেন তাঁর 'ডিসকোর্স অন মেথড' গ্রন্থে। তাঁর এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, 'I think, hence I am'[১৮] এর বিপরীতে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা বলেন, এটি পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে বিষয়টা উল্টো, 'আমার অস্তিত্ব আছে বলেই আমি চিন্তা করি। কেননা ব্যক্তিকে চিন্তা করার বিষয় লাগবে, এ বিষয়মুখী চেতনাকে হুসার্ল ও সার্ত্রে অবভাস বলেছেন; যা ব্যক্তিকে চিন্তা করতে অনুপ্রেরণা প্রদান করে। অর্থাৎ এখানে চিন্তন পূর্ব প্রাথমিক চেতনাকে সার্ত্রে যে অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন, তা অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্তর। এরপর ঐ চেতনার বিষয়কে নিয়ে ব্যক্তিমানুষের চিন্তা আরম্ভ হয়। যেমন, একজন তরুণ অবিবাহিত সুশিক্ষিত যুবকের কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে বিবাহ করার কামনা জাগ্রত হয়। এ ধরনের জাগরিত কামনা ব্যক্তির প্রাথমিক চেতনা বা বিষয়মুখী চিন্তা। পরে সেই মেয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলে। মেয়েটির লেখাপড়া আছে কি না, তার বংশমর্যাদা কীরকম, তার পূর্বে কোনো বিবাহ হয়েছে কি না বা তার কোনো প্রেমিক আছে কি না, তার স্বভাব চরিত্র কি রকম ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি মনের অভ্যন্তরে একক আত্মকথন শুরু হয়। এ আত্মকথন বা ইনটিরিয়র মনোলগ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। এসব চিন্তা ব্যক্তির অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়।

---

16 Soren Kierkegaard, *Purity of Heart,* trans. by Douglas V. Steere, New York, Harper Torchbook, 1956, p.184.

17 ড. আমিনুল ইসলাম, AvaywbK cvðvZ¨ 'kb, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ৭৩ ।

18 Rene Descartes, op. cit., p. 27.

ব্যক্তিমানুষ দু'ধরনের জীবনযাপন করে। এক, গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকে যে কাজগুলো করে যেগুলো দৈনন্দিন নিত্য কাজের অন্তর্গত এবং এগুলো করার মধ্যে ব্যক্তি নিজের কোনো স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে না। দুই, ব্যক্তি যখন কোনো সংকটের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন এ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার এ সিদ্ধান্ত স্বকীয় অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যেসব ব্যক্তিমানুষ গোষ্ঠীনিয়ম বা সামষ্টিক নিয়ম পালন করে, তাদের অস্তিত্ব শুধু বেঁচে থাকার অস্তিত্ব, যথার্থ অস্তিত্ব নয়। যথার্থ অস্তিত্বে মানুষ তার নিজের ভাবাবেগ ও অনুভূতি দ্বারা স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে এবং যেকোনো সংকটের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে রক্ষা ও সংকট থেকে উত্তরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সোরেন কিয়ের্কেগার্ড বলেন, "অস্তিত্বকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের ভাবাবেগ ও অনুভূতি দিয়েই জানা সম্ভব।"[১৯] ব্যক্তি নিজের ভাবাবেগ দ্বারা উপলব্ধি করে যে, সে একজন ব্যক্তি, তাকেই জীবনের সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যেই সে বুঝতে পারে, তার অস্তিত্ব আছে। প্রাত্যহিক জীবনে হয়তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন কোনো পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে, সে কী করবে, তখন তার সামনে যে কয়েকটি দায়িত্ব আছে, তার সবগুলোই সমান আবশ্যকীয়, কিংবা একটি অন্যটির চেয়ে আবশ্যকীয় হলেও, দুটির কোনোটিকেই সে অবজ্ঞা করতে পারছে না, তখনই সে সংকটে পড়ে। যেমন, ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে নাকি অসুস্থ মায়ের সেবা করবে, সে এ উভয় সংকটের সময় কোনটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করবে তা তার একান্তই নিজস্ব বিচার-বিবেচনার বিষয়। কিয়ের্কেগার্ড নিজের জীবনে এরূপ সমস্যায় পড়েছিলেন, তিনি রেজিনা ওলসনের প্রতি ভালোবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি সেবার মধ্যে কোনটিকে তিনি বেছে নেবেন বলে ঠিক করতে পারছিলেন না। এ অনিশ্চয়তা এবং সফল না হওয়ার উদ্বেগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি–এ সব অন্তর্মুখীনতার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বুঝতে পারে সে আছে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার ব্যক্তির জগতের সাথে সম্পর্কিত রেখে তা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "...Two M. Heidegger fundamental modes of Being, authenticity and unauthenticity, are distinguished, both of them depending on the fact that 'Dasein' is essentially always my own."[20] এখান থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের সত্তা কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির সময় নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব স্বকীয়তা প্রকাশিত হয়। এজন্য ঘটনার যথার্থতা ও অযথার্থতা ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। হাইডেগারের অযথার্থতা থেকে যথার্থতা এবং সার্ত্রের আঁ-সোঁয়া থেকে পুর-সোঁয়া উপনীত হওয়ার জন্য স্বাধীন সত্তার মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন কিছু হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের সম্ভাব্যতায় সফল হওয়ার জন্য বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি বা ভাবাবেগকে বেশি গুরুত্ব প্রদান

---

19 ড. নীরুকুমার চাকমা, A¯ÍZev' I e¨³¯'vaxbZv, ঢাকা, বাংলা একাডেমি প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩।

20 M. Heidegger, *Existence and Being*, London, Vision Press Ltd. 1968, p. 28.

করেছেন। কেননা ব্যক্তির এ গতি সত্তা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে নিজের যুক্তিহীন জীবনের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীন সিদ্ধান্তে সফল হওয়ার অনিশ্চয়তা ও নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব গড়ে ওঠে। অস্তিত্ব গড়ে ওঠার পিছনে উভয়ই স্বাধীন সত্তার ভূমিকার কথা স্বীকার করলেও হাইডেগার শুধু ব্যক্তি মানুষের জগৎস্থিত সত্তাকে পুনর্নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর সার্ত্রে দেহযুক্ত সত্তা একেবারে শূন্য অবস্থান থেকে আত্মনির্মাণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নিম্নে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে মার্টিন হাইডেগার ও সার্ত্রের অস্তিত্ব নির্মাণের বৈপরীত্য দেখানো হলো :

M. Heidegger : Being/sein ⇨ Sosein/World ⇨ Dasein/Human Existence

J. P. Sartre : Existenc /en-soi ⇨ Action (World adversity Anguish, Frustration, fear Fear) ⇨ Pour-soi/ Essence (Authenticity, Freedom)

স্বাধীন অস্তিত্ব মানেই ব্যক্তিমানুষের যথার্থ সিদ্ধান্ত, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, সহনশীল ক্ষমতা, পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, যথার্থ আচরণ, বিবেচনা শক্তি, যুক্তি মাধ্যমে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা, অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা, তাৎক্ষণিক সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার ক্ষমতা, যুক্তির মাধ্যমে অন্যকে পরিচালনা করার ক্ষমতা, উন্নত রুচিবোধ, নিজস্ব স্বভাব, উন্নত অভ্যাস ও নিজস্ব মূল্যবোধ ইত্যাদি। যা ব্যক্তি অর্জন করে স্বাধীনভাবে নিজস্ব কর্ম নির্বাচন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সেই অস্তিত্ব ব্যক্তির মধ্যে নিহিত থাকে শূন্য খোলস হিসেবে যেন অপর ব্যক্তি সহজে জানতে না পারে। যেমন, 'ক একজন ব্যক্তিমানুষ' তাহলে ক-এর সাথে খ নামক ব্যক্তিমানুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করে ক-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝা যায়। তাছাড়া সংকটের মধ্যে কে, কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং কে, কী ধরনের আচরণ বা কাজকে বেছে নিচ্ছে তা বিবেচনা করেও ব্যক্তিমানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তিত্ব আলাদা হওয়ার কারণে আমরা একজন ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির তুলনা করে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে বের করি। অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতারই মূল্য নির্ণয় করা হয়, সেখানে যুক্তিকে একমাত্র পন্থা বলে গ্রহণ করা হয় না। কারণ তাহলে জীবনের এমন সব অভিজ্ঞতা আছে, যেগুলো যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তাদের বাদ দিতে হয়। কিন্তু মানবজীবন সব অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অতএব মানবজীবনকে জানতে হলে অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ও স্বকীয় রূপের মধ্যে তাকে খুঁজে দেখতে হবে। মানবজীবন শুধু যুক্তিবোধ্য নয়, অনুভূতিও মানবজীবনের আর একটি বড় দিক। এজন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন-রূপ যে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাবে, তাকেই জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি অভিজ্ঞতার উপাদানে যে স্বতন্ত্র

ব্যক্তিজীবন গঠিত, তার সবটুকু প্রকাশই অস্তিত্ববাদের মূলকথা। তবে অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি যখন শিক্ষা নিবে তখন ভবিষ্যতে সে একই ধরনের ভুল আর করবে না। এ শিক্ষামূলক অনুভূতি ব্যক্তির স্বকীয় অস্তিত্ব গঠনে সহায়ক।

মানুষের অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করাই ছিল অস্তিত্ববাদীদের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। অস্তিত্ব গড়ার কাজ যে সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব একাকিত্ব জীবনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব তা সার্ত্রে পিতার মৃত্যু এবং বারো বছর বয়সে তার মাতার অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পরই বুঝতে পারেন। সে কারণেই তাঁর বেড়ে ওঠার মধ্যে নিঃসঙ্গবোধের স্বাধ পেয়েছিলেন ও বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এজন্য তাঁর জীবন অনুশীলন করলেই অস্তিত্ববাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জানা যাবে। শৈশবকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর 'আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থে বলেন, "…he wanted some compensation for unfrocking himself : since he had given up forming minds, one of his sons would form souls. "[21] তাঁর পিতামহ মনে করেছিলেন যে, যাজক হয়ে সে মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে। কিন্তু তিনি যাজক না হয়ে হয়েছিলেন একজন স্বনামধন্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিক; যিনি চিন্তা করেছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব কীভাবে সৃষ্টি করা যায়। তিনি আরও বলেন, "এ বিশ্বজগৎ হলো পাপের এক শিকার, মুক্তির উপায় শুধু একটিই, এবং সেটি হলো নিজের জন্য ও পৃথিবীর জন্য মৃত্যু বরণ করা, এক জাহাজডুবির অতল হতে অসম্ভব ধ্যানধারণা চিন্তা করা।"[২২]

এসব দিক থেকে বলা যায়, শৈশবকাল থেকে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত ছিলেন একা, যার বাবা নেই, মা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় দেখাশুনার করার জন্য মা নেই, সুনির্দিষ্ট গৃহও নেই। এদিক থেকে বেড়ে ওঠার দিনগুলো এত একাকিত্বের ছিল যে, আত্মজীবনীতে নিজের সম্পর্কে এরকমটিই উল্লেখ করেছেন জাঁ-পল্ সার্ত্রে। এরূপ নিঃসঙ্গ ও একাকিত্ববোধ থেকে অনন্য বা দুর্লভ জ্ঞান অনুশীনের মাধ্যমে তিনি তাঁর অস্তিত্ববাদী

---

21 Jean-Paul Sartre , *Words,* translated by Irene Clephane, London, Hamish Hamilton. 1964, p.9.

22 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, kã, ভাষান্তর, লোকনাথ ভট্টাচার্য কলকাতা, সাহিত্য একাডেমি প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১৩২।

দর্শন নির্মাণে সক্ষম হন বলে গবেষক মনে করেন। কেননা আমরা জানি, ব্যক্তিজীবনের মূল সত্যটি হলো, ব্যক্তির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। এ সূত্রকে কেন্দ্র করে অস্তিত্ববাদের উদ্ভব হয় বলে ধারণা করা হয়। এজন্য বলা হয় যে, সংকটই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী। এ প্রসঙ্গে P. F. Strawson বলেন, "The crucial point is the requirement that apparatus of explicit existential claim is to occupy the same place in sentences as logical subject-expressions may coherently occupy. This requirement can be seen as the result of a highly respectable wish to work with a formal and univocal concept of existence. "[23]

অস্তিত্বের বিকাশ হয় ব্যক্তিমানুষের বিভিন্ন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্য থেকে। এ ধরনের পরিস্থিতি ব্যক্তিমানুষকে আত্মতন্ময়তার দিকে নিয়ে যায়। আর তা থেকে ব্যক্তি আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি সত্তার বিপরীত বিষয়গুলোকে পদদলিত করে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে। এ অস্তিত্ব গঠন সম্পর্কে Jean-Paul Sartre' বলেন, "Existential psychoanalysis is a method destined to bring to light, in a strictly objective form, the subjective choice by which each living person makes himself a person; that is, makes known to himself what he is. "[24] এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিসত্তা যখন নিজ পছন্দ বা রুচিবোধ অনুযায়ী কোনো কাজ, আচরণ ও বিষয়কে নির্বাচন করে এবং সে কাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তাঁর কাজটি কতটা সঠিক তা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে নিয়োজিত হয় তখন থেকে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার রক্ষার্থে উদ্ভব ঘটেছে অস্তিত্ববাদের।

আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এ তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানুষ হয়েছে গৌরবান্বিত, কিন্তু তার সাথে হারিয়েছে নিজের ব্যক্তিসত্তা তথা স্বাধীনতাকে। মুক্তবাজার অর্থনীতি, মোবাইল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটসহ যেকোনো প্রযুক্তি মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে, তাই মানুষ হয়েছে যন্ত্রের কৃতদাস। অর্থাৎ মানুষের ওপর প্রযুক্তি আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই মানুষ নিজের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অনেক বেশি সচেতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্বন্ধে। নিজের অস্তিত্বের চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান অর্থ, কম্পিউটার, মোবাইল, নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রভৃতি। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষ শুধু যে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছে তা নয়, তার জীবনে এসেছে এক বিরাট শূন্যতা। এ শূন্যতার কারণে মানুষ তার নিজের

---

23 P. F. Strawson, *Individuals,* London, Methuen & Co. Ltd. 1959, p. 239.

24 Jean-Paul Sartre', *Being and Nothingness,* trans. H. E. Barnes, London, Methuen & Co.Ltd, 1957, p. 568.

ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম গডউইন বলেন, "যার নিজের ওপর প্রভুত্ব নেই, সে কখনও স্বাধীন হতে পারে না।"[২৫] নিজ সত্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ এতই প্রযুক্তিমুখী হয়ে পড়েছে যে, ব্যক্তিমানুষ তার নিজের সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু বা প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ওপরই যেন ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। ব্যক্তিমানুষ হয়ে পড়েছে অতি নগণ্য ও অবহেলিত। এসব পেশিশক্তির বিরুদ্ধে ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবের প্রতিবাদস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে অস্তিত্ববাদ।

ব্যক্তিমানুষ রোবটের মতো যন্ত্র দ্বারা চালিত হবে না। যন্ত্রের ওপর বরং সে আধিপত্য করবে। মানুষ শুধু রাষ্ট্রের একজন নাগরিক নয়; বরং তার একটি ব্যক্তিসত্তা আছে, আর ব্যক্তিসত্তার কাজ হচ্ছে সচেতন হয়ে নিজের অস্তিত্বকে (অর্থাৎ নিজের ভিতরের স্বাতন্ত্র্য গুণাবলি) বুঝতে পারা। যেমন, নিজেই নিজের পরিচয় বা সংজ্ঞা দেওয়া, নির্বাচন করা, নিজেই নিজের ভাগ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং নিজের স্বভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। যেমন, প্রেম, বিনয়, পরোপকারিতা, ধৈর্য, চিন্তাশীলতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নির্লোভিতা ইত্যাদি। এসব চেতনাসমৃদ্ধ গুণাবলি ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার মধ্যে সৃষ্টি করবে অভিজ্ঞতালব্ধ অবভাসিক উপাদানকে সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষ চেতনা দ্বারা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে। নিরপেক্ষ বা স্বাধীন চেতনা ও আত্মজিজ্ঞাসাই ব্যক্তি অস্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে Jean-Paul Sartre বলেন, "…Human reality, far from being capable of being described as libido or will to power, is a choice of being."[26] যেমন, প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সাধারণ জৈবিক শক্তি থাকে পাশাপাশি এ জৈবিক শক্তির বাইরেও এক ধরনের ইচ্ছাশক্তি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই জৈবিক শক্তিগুলো হিংস্র ও আক্রমণাত্মক।

সচেতনভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা গভীর অনুভূতির দিয়ে এবং ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন চেতনা থেকেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের উদ্ভব। বিশ শতকের মধ্যভাগে সার্ত্রে তাঁর 'সত্তা ও শূন্যতা' নামক দার্শনিক গ্রন্থে অস্তিত্ববাদী দর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষ হলো 'স্বহেতু সত্তা' নিজের জন্য নিজের সত্তা। নিজেকে ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে তৈরি করে সে নিজেই। মানুষই বলতে পারে 'না'; স্বাধীন চেতনায় তার সমস্ত সুরক্ষিত ব্যবস্থা সে পাল্টে দিতে পারে, অস্বীকার করতে পারে এ ব্যবস্থাকে। তাই তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় অনিশ্চয়তার উদ্বেগ–এই হলো মানুষের মৌল উপাদান।"[২৭] ব্যক্তিমানুষ একমাত্র সত্তা যার দ্বারা ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি

---

25 উইলিয়াম গডউইন, evYx wPišÍbx, তপন রুদ্র সংকলিত, ঢাকা, সালমা বুক ডিপো প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ২০৬।

26 Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 602.

27 শ্রাবন্তী ভৌমিক, te‡P _vKvi 'kb, কলকাতা এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১২৩।

নিজেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজের ভিতরে সব ধরনের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, হতাশা ও গতানুগতিক ধ্যানধারণা আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে দূরীভূত করে নিজেকে শূন্য থেকে তিলে তিলে তৈরি করতে পারে। এজন্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা নিজ অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁদের মতে, অস্তিত্ব জানতে হবে অন্তর্মুখী পদ্ধতির দ্বারা নিজ অভিজ্ঞতাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে| অস্তিত্ববাদ দর্শনের এ বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে সার্ত্রের একটি কথায়-যখন তিনি বলেছেন, আত্মিকতা (Subjectivity) থেকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে। সেই আত্মিকতা ব্যক্তি ভুলে বাহ্যিক বস্তুর সাথে সখ্যতা সৃষ্টি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলতে চান, "প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনে তা আমরা ভুলে যাই। মিথ্যা বিশ্বাসের আবরণে স্বাধীনতাকে ভুলে থাকা আমাদের অযথার্থ অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতার চেতনাতেই আমরা যথার্থ অস্তিত্বে উন্নীত হতে পারি।"[২৮]

ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব স্বাধীন চেতনায় অবস্থান না করার কারণে মিথ্যা অনুভূতি ব্যক্তিকে প্রতারণা করে এবং মানুষগুলো দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। এ রকম থাকার ফলে যে অস্তিত্ব তৈরি হয়, তা হচ্ছে অযথার্থ অস্তিত্ব। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, মানুষ যদি সদাচেতন অবস্থায় থাকে তাহলে সে তার সঠিক অনুভূতিকে বুঝতে পারে, প্রতি মুহূর্তে তার অনুভূতিতে কী ধরনের এবং কোন বিষয়ে চেতনা আগমন হচ্ছে তা উপলব্ধি করে আবার সেই অনুভূতির কতটুকু অর্থ আছে তা গ্রহণ করে, আর বাকি অনুভূতিকে অর্থহীন, অযথার্থ ও প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করে পরিত্যাগ করে। আবার যথার্থ অনুভূতি কী এবং কোনটি আমার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নির্বাচন করে, সেই লক্ষ্যের দিকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এ যথার্থ চেতনার দিকে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে স্বাধীন চেতনা। এজন্য বলা হয়, মানুষ হওয়া এবং মানুষের স্বাধীনতা থাকা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ মানুষ হওয়া আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। অন্য কথায়, মানুষ হওয়া মানেই হলো স্বাধীন হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার মানে হলো যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ হওয়া। সার্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা; বরং উদ্দেশ্য ছিল মানবজীবনে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। সার্ত্রে অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার মূল্য খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর লেখালেখির মধ্যে। তাঁর নিজস্ব উক্তি-

> "জীবন শুরু করেছি আমি বইয়ের মধ্যে এবং নিঃসন্দেহে সেখানেই শেষ করব। ভয় পেতাম বইগুলো কী বলছে? কারা লিখছে ওগুলো? কেন? আমার ধর্ম আমি খুঁজে পেয়েছিলাম; বইয়ের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় কোনোকিছুকে মনে হতো না। গ্রন্থাগারকে আমি মন্দিরের

---

28 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, ভাষান্তর, মৃণালকান্তি ভদ্র, কলকাতা, বিজ্ঞাপনপর্ব প্রকাশ (১) ২০০০, পৃ. ৩১।

> মতো দেখতাম। ... লেখার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করে দিলাম। লেখার মধ্যেই আমার জন্ম। লিখে আমি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলাম, বড়দের কাছ থেকে পালিয়েছিলাম, কিন্তু আমার অস্তিত্ব ছিল শুধু লেখার জন্যে।"[২৯]

সার্ত্রে প্রথমে কোনো বিষয় বা বস্তুকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে তারপর লেখা শুরু করতো। লেখার জন্য তাঁর কলমকে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো এবং লেখার মধ্যেই তিনি তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করতেন।

সর্বশেষে বলা যায় যে, জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী চিন্তাভাবনা সমস্ত অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হলেও তাঁর অন্তর্জীবনে ছিল একটি ঘটনাবহুল নাটক-যা বুদ্ধিদীপ্ত। এর আগে তাঁর চেয়ে অস্তিত্ববাদী দর্শনের জগতে এমন কোনো স্বচ্ছ এবং সাবলীল চিন্তা দেখা যায়নি। কিন্তু প্রচলিত চিন্তারীতির বিরুদ্ধে তিনি যে আক্রমণ করেছেন, তা হয়তো নতুন ছিল না। তাঁর উপস্থাপনায় কৌতুকদীপ্ত উদাহরণ এবং কাহিনির উজ্জ্বলতায় তা ছিল অভূতপূর্ব। তিনি দেখলেন, বেশিরভাগ দর্শনেই বাস্তব জীবনের সাথে কোনো যোগসূত্র নেই। কেননা, বাস্তব জীবন দর্শন অনেক যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব ও হতাশা দ্বারা পরিপূর্ণ। ব্যক্তিস্বাধীনতাই কেবল পারে, বাস্তব জীবনের সব সমস্যার সমাধান করে নিজেকে অস্তিত্বশীল করতে। এ প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদের মূল বক্তব্য এই যে, "ধ্বংসের পরিস্থিতিতে, অসহনীয় অবস্থাতেও মানুষ স্বাধীন। মানুষ নিজে তার সিদ্ধান্ত নিবে এবং সেখানেই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।"[৩০] তাহলে বুঝা যায় যে, এ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় ব্যক্তির সংকট ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্মুখী মননশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর মানুষের অন্তর্মুখী মননশীলতা থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যক্তির অস্তিত্বের বিকাশ ও প্রসার ঘটে।

---

29 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, মুখোমুখি, সম্পাদনা, উৎপল ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

30 শ্রাবন্তী ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

1.2 A¯ÍZ I A¯ÍZev‘x ‘kb

‘অস্তিত্ব’ শব্দটি জগতের সবকিছুর সাথে সম্পর্কিত হলেও অস্তিত্ববাদী দর্শনে এ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি Existence-এর বাংলা পরিভাষা ‘অস্তিত্ব’। Exist শব্দটির সাধারণ অর্থ "Where some particular things is indicated. Such a sentence seems to express a contingent truth"[31] ‘অস্তিত্ব’ শব্দটির বিশেষ অর্থ Stand out, অর্থাৎ সচেতনভাবে ক্রম অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ, অথবা ব্যক্তির অন্তরের বিচিত্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। এ ক্রম অভিব্যক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে সচেতনভাবে নিজের বর্তমান অবস্থানকে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ সাধন করার নামই অস্তিত্ব। আর এ ধরনের অস্তিত্ব নির্মাণে ব্যক্তিসত্তাকে স্বাধীন হতে হয়। স্বাধীনতা সম্পর্কে সাত্রে বলেন, "By the same token freedom appears as an unanalyzable totality; causes, motives and ends, are organized in a unity within the compass of this freedom and must be understood in terms of it. "[32]

জাঁ-পল্ সার্ত্রের মতো অস্তিত্ববাদীদের মতে, “মানুষের নিয়ন্ত্রণ সত্তা বা কর্তৃসত্তা বলতে কিছু নেই। অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তির নিজস্ব ভাবাবেগ, আবেগ-অনুভূতি, পছন্দ, রুচিবোধ, প্রতিকূল ও অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত, সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে সব প্রাণী, বস্তু ও ঘটনাকে দেশ ও কালের মাধ্যমে উপলব্ধি ইত্যাদি সবকিছুই ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণ।”[৩৩] আর এ ধরনের অস্তিত্ব ব্যক্তির চেতনা সম্পর্কিত বিধায় অস্তিত্ববাদী দর্শনে এ বিষয়টি আলোচিত ও আলোড়িত হয়েছে এবং দর্শনের ইতিহসে একটি আন্দোলনের ধারা হিসেবে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, অস্তিত্ববাদ হলো মূর্ত ব্যক্তি মানুষের জীবনদর্শন; যার কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা বলে কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, “একটি যথার্থ গ্রহণযোগ্য নাস্তিক অবস্থা থেকে যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করাই অস্তিত্ববাদের লক্ষ্য।”[৩৪] এ ধরনের সিদ্ধান্ত একমাত্র স্বাধীন

চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভব। চেতনা যেহেতু দর্শনের সাথেও সম্পর্কিত সেহেতু দর্শন সম্পর্কে সার্ত্রের অভিমত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, “দর্শন হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ চেতনাবোধ, যা খুব কম সময়েই এবং বাঁধা-ধরা পরিস্থিতিতেই ঘটে। এটি হচ্ছে সর্বগ্রাসী পূর্ণতা, যা প্রতিবিম্বিত করে কোন দৃষ্টিতে উচ্চতর শ্রেণিরা দুনিয়াকে দেখে

---

31 Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary Of Philosophy*, New York, Oxford University Press, 1996, p. 129.

32 Jean-Paul Sartre, *Of Human Freedom*, Edited by Wade Baskin, New York, Philosophical Library,1966, p. 43

33 ড. আমিনুল ইসলাম, ‘kb fvebv mgm¨v I mªvebv, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ২৭০।

34 ঐ, পৃ. ২৭০।

থাকে, কোন দৃষ্টিতে এ শ্রেণি নিজেকে দেখে এবং বর্ণনা করে, এর সচেতনতা, জীবনের প্রকৃত সমস্যাবলি সমাধানের একটা পদ্ধতি এবং এ দর্শন এদের একটি অস্ত্র, যা বিরোধী শ্রেণিসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে।"[৩৫]

জাঁ-পল্ সার্ত্রের চিন্তাকে অস্তিত্ববাদী দর্শনে রূপান্তর করেছেন সত্তা ও শূন্যতা নামক দুটি ধারণাকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে Kalyan Sen Gupta বলেন, " There are two distinctive trends in the philosophy of Sartre. On the one hand, Particularly in Being and Nothingness, he dwells on human Existence, which centres around decision, choice, and therefore freedom. Here the focus is on the individual left to himself with responsibility for his choice and the consequent anguish. "[36] ব্যক্তি চেতনাসম্পন্ন বিধায় আত্ম-অতিক্রম করার এবং কোনো বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা আছে। এজন্য অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে স্বাধীনতা। তবে অস্তিত্ববাদীরা যেভাবে অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা গতানুগতিক এবং তা অন্যান্য দার্শনিকদের থেকে আলাদা। কেননা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি আলাদা আলাদা রূপ ধারণ করে থাকে। এজন্য এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া একটা জটিল ব্যাপার। অস্তিত্ববাদ বলতে অনেকে মনে করেন, নাস্তিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, নিঃসঙ্গবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ ও অবক্ষয়বাদ প্রভৃতি। আর গবেষক মনে করেন, এ দর্শন আত্মনির্মিত ও মানবতাবাদী দর্শন। এজন্য ব্যক্তিমানুষকে তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হবে উদ্বেগ, দ্বন্দ্ব, হতাশা, ভয়, মনস্তাপ, একাকিত্ব ও দুঃখ ইত্যাদির দূরীকরণের মাধ্যমে। তবে জাঁ-পল্ সার্ত্রে অস্তিত্ববাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এমন এক মতবাদ হিসেবে যে মতবাদ মানবজীবনকে সম্ভবপর করে তোলে এবং সে মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি সত্য এবং প্রতিটি কর্ম তার স্বনির্ধারিত, যার মাধ্যমে নিজেকে এবং জগৎকে গতিশীল করে তোলে। কেননা প্রত্যেক মানুষের জীবনে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে; আর সে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে কর্মধারার দিকে অবিরাম প্রচেষ্টা চালায় তাই তার অস্তিত্ব। গবেষক মনে করেন, ব্যক্তি নিজ স্বাধীন চেতনা দ্বারা অর্থপূর্ণ কোনো উক্তি, অভিনব সূত্র, নতুন চিন্তা, সংস্কারমূলক মতবাদ, নতুন কিছু আবিষ্কারকে এবং ব্যক্তি নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করবে, সেই প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই ব্যক্তির অস্তিত্ব বলে। এ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যা আবিষ্কার করতে, যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সে তার ইচ্ছানুযায়ী কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছে তাই তার স্বঅর্জিত অস্তিত্ব। এজন্য অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্ব কোনো পূর্বনির্ধারিত নয়; বরং স্বঅর্জিত। এ নিজ অর্জিত ইতিবাচক গুণাবলি ব্যক্তির জীবনে যখন প্রয়োজন মিটাবে ব্যক্তি তখন হয়ে উঠবে নিজেই এক শিল্পের মতো, যা তাকে দিবে যথাযথ আর্থিক সুবিধাসহ সম্মান ও

---

35 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, সত্তা ও শূন্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

36 Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha, *Sartre's Remembering,* Kolkata, Das Gupta & Co. Pvt. Ltd. 2007, p. 37.

পরিচিতি। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব কোনো সৃষ্টিই হলো তার অস্তিত্ব। এজন্য জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেছেন, "অস্তিত্ববাদ শব্দটি হলো একটি মতবাদ যা মানবজীবনকে সফল ও পূর্ণ করে তোলে। মানুষের আত্মগত মনোভাব এবং পরিবেশ উভয়কে ইঙ্গিত দেওয়া প্রত্যেকটি কাজ ও প্রত্যেকটি সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে এটি এমন একটি মতবাদ।"[৩৭] এ সংজ্ঞাটিতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুকূল পরিবেশ ও কাজ; যা তার অস্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া অস্তিত্ববাদ দর্শনে প্রারম্ভিক সূত্র আত্মিকতা ও আত্মাতিক্রমণের চেষ্টা। তবে তার এ আত্মিকতা অবশ্য ভাববাদী আত্মিকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন; যা পরবর্তীতে আলোচনা থেকে বুঝা যাবে। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদকে বিশ্লেষণ করে ড. নীরুকুমার চাকমা অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, "অস্তিত্ববাদ হলো এমন একটি দার্শনিক আন্দোলন–যা ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে, সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে; বিমূর্ত, কাল্পনিক বা বস্তুগত ধারণা হিসেবে নয়, মূর্ত ও বাস্তব ধারণা হিসেবে; অর্থাৎ অস্তিত্ব যেভাবে বাস্তবে কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, সেভাবে।"[৩৮]

সার্ত্রে তার অস্তিত্ববাদে মানুষের স্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও সম্ভাবনাকে প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবায়নকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষ সম্ভাবনা ও স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি এবং এ দুটিকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষ যা আছে, তা থেকে যা সে নয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। Harold H. Titus অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে বলেন, "Existentialism is an attitude and outlook that emphasizes human existence that is, the distinctive qualities of individual person-rather than man in the abstract or nature and the world in general."[39] এখানে অস্তিত্ব বলতে বুঝায় মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনা। কেননা মানুষের মন বহু সম্ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণ। মানুষ যা হয়ে উঠতে চায় বা সে কী অর্জন করতে চায় তা হয়ে ওঠা বা অর্জন করার জন্য সুপ্ত বীজ তার মধ্যে নিহিত আছে। এজন্য ব্যক্তিকে সার্বিক সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, নিজস্ব স্বাধীন সত্তা দ্বারা পরিবেশ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তাছাড়া, ব্যক্তি জাগতিক পরিবেশের মধ্যে অনেক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ব্যক্তিকে Authentic Existence (যথার্থ অস্তিত্ব) দিকে নিয়ে যায়। উদ্বেগ, সংকট বা প্রতিকূল অবস্থা মানুষের সার অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে Mary Warnock বলেন, "Absolute existentialism, according to our definition, is the attempt to make existence alone the basis of philosophy and of ultimate knowledge. It is founded on the belief that-as many existentialists put it-'existence precedes essence' this belief has several

---

37 জাঁ-পল্ সার্ত্র, A¯ÍZev‘ I gvbexq Av‡eM, ভাষান্তর, অরুন হাতি, কলকাতা, দীপায়ন, ২০১২, পৃ. ৬২।

38 ড. নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

39 Harold H. Titus, *Living Issues In Philosophy*, New Delhi, Eurasia Publishing House, 1968, p. 296

implication."[40] অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, ব্যক্তি ঘটনার পূর্বগামী সত্তা হিসেবে নিজে নিজেকে বুঝতে হবে, তার অজ্ঞতা দূর করবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, নিজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। অস্তিত্ব বলতে সার্ত্রে দু'ধরনের অস্তিত্বের কথা বলেছেন যার একটি বস্তু ও যার নাম দিয়েছেন স্বহেতু সত্তা এবং অপরটি ব্যক্তির অস্তিত্ব যার নাম দিয়েছেন স্বনির্ভর সত্তা। এ প্রসঙ্গে Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha বলেন,

> Satre we shall now review the fundamental points of Sartre's existentialism. There is something special in his play with the term, existence. Objects exists and so do human beings. But objects are what and as they are: their identity is fixed and a complete description of them is possible. Human beings on the contrary are what they are not. They are always ahead of themselves.This means that they have always the possibility of being otherwise than what they are. This possibility of transcendence is the real meaning of existence, and belongs exclusively.[41]

অস্তিত্ববাদী সার্ত্রে ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীরা সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ব বলতে একমাত্র ব্যক্তিমানুষের আত্মাতিক্রমণের সম্ভাবনাকেই বুঝিয়েছেন। মানুষ ছাড়াও এ পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের অগণিত বাহ্যবস্তু ও অসংখ্য জীবজন্তুর বাস। অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন, এ জগতে বহু বস্তু ও প্রাণী আছে; কিন্তু অস্তিত্ব নেই। যেমন, মনে করা হয় একটি কয়লা বাস্তব কিন্তু অস্তিত্বশীল নয় অথবা একটি শিম্পাঞ্জি প্রাণী; কিন্তু তার অস্তিত নেই কিংবা একটি উদ্ভিদ বাস্তব; কিন্তু অস্তিত্বশীল নয়। কেননা তারা নিজেদের বিকাশ ঘটিয়ে অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ এ কাজটি করতে সক্ষম; তাই মানুষই একমাত্র অস্তিত্বশীল। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষই একমাত্র সত্যিকার অর্থে বাস্তব, আর অন্য সব জিনিস অবাস্তব, মায়া বা মানুষেরই ধারণা। কেননা এ দর্শন হলো ব্যক্তি মানুষের বর্তমান অবস্থা বা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দর্শন। এজন্য অস্তিত্ববাদীগণ to live এবং to exist এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। একটি জীবের বেঁচে থাকা ও একটি মানুষের বেঁচে থাকার এবং হয়ে ওঠার মধ্যে কী ধরনের পার্থক্য আছে তা উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু এটিও ঠিক যে, অনেক মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে একটি বস্তু ও একটি ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। অতএব বলা যায়, কেবলমাত্র এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে বেঁচে থাকলেই এবং সাধারণভাবে জীবনধারণ করলেই তাকে অস্তিত্বশীল বলা যাবে না। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো একপ্রকার

---

40 Mary Warnock, *Existentialism,* New York, Oxford University Press, 1986, p. 118.

41 Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha, op. cit., p. 38.

বিশেষ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া। ব্যক্তি সাগ্রহে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়, বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তাই অস্তিত্ব কখনো বুদ্ধি বা তাত্ত্বিক চিন্তার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়, একমাত্র অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতা বা মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই অস্তিত্বকে জানতে হবে। অস্তিত্ববাদী এ দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে জাঁ-পল্ সার্ত্রের উক্তিতে। তিনি বলেন, আত্মিকতা বা বিষয়ীকতা থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে এবং এর মাধ্যমে সর্বজনীন সত্যগুলোকে উদঘাটন করতে হবে। আর এ কারণেই সর্বজনীন স্বীকৃত প্রত্যেকটি সত্যই এক একটি অস্তিত্ব। এ প্রসঙ্গে Martin Heidegger বলেন, "The question 'what is existence?' is like the question 'what is truth?' both have the appearance of being about a property. In the way each seems to resemble questions like what is smoothness? or what is jealous? But it is always safer to ask what it is to ascribe a property to something than to ask. "[42]

একজন ব্যক্তির একাকিত্ব নিজ জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ভোগ-দুর্ভোগের মতো সব অনুভূতি কি অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়-কি? এর জন্য পরিবেশ দায়ী নাকি ব্যক্তি নিজে সর্বশেষে নাকি বিধাতার অভিশাপ না আশীর্বাদের ফলস্বরূপ এটি বিবেচনায় নিতে হবে। এসব প্রশ্নের উত্তর অস্তিত্ববাদ দর্শন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে তা হলো, ব্যক্তি নিজেই সকল সুখ ও দুঃখের স্রষ্টা। কিন্তু আমরা বিপদে পতিত হলে সার্বিক সত্তাকে দোষ দিয়ে শেষে সার্বিক সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ করে থাকি। নিজেকে দোষারোপ না করে ভাগ্যবিধাতাকে দোষারোপ করা মানেই হলো নিজ স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করা। যার ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশ ও নিজ শক্তিকে উপেক্ষা করে থাকে। এ দর্শন মানুষের অস্তিত্ব অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল হোক একথা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। মানুষের স্বাধীন কর্মধারা সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বিমূর্ত সাগরে না ডুবে ব্যক্তিকে অস্তিত্ববান, বাস্তবময়, কর্মমুখী এবং নির্বাচনমুখী হতে হবে। এ দর্শনে ব্যক্তি মানুষকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বিমূর্ত গুণাবলিকে গৌণ করা হয়েছে। সুতরাং এ দর্শন অবাস্তব প্রত্যয় দেশ থেকে এবং সম্ভাবনাময় স্তর থেকে বাস্তবের দেশে উত্তরণের দর্শন।

অস্তিত্ববাদী দর্শন মানবজীবনে অনুসরণ করতে হলে একজন অস্তিত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে সব বিষয়ে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা থাকবে এবং ব্যক্তি বেশি প্রাধান্য দিবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো। যেমন, "নিকটবর্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানবে এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা এসবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এসবের অভাবই মূল্যবোধের অভাব।"[৪৩] এগুলো অস্তিত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ

---

42 Martin Heidegger, *Basic Writings,* London, Routledge, 1993, p. 90.

43 মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ms¯‹Z K_v, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশ, 20০৪, পৃ. ৪০।

ও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকবে। তাই অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেয়ে এর বর্ণনা প্রদান করা সহজ। এ দর্শন আত্মবিনাশের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। যান্ত্রিকতা, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও নীতির নামে ব্যক্তিকে গ্রাস করে। অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রকৃত জীবনযাত্রার সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে, বাস্তবসম্মত নেতিবাচক বিষয়ের সাথে সরাসরি মোকাবিলা করে নিজের অস্তিত্বকে বিকশিত করে।

নৈতিক অবক্ষয়, শিল্পোন্নত জগতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতার মূল্য জাগিয়ে তোলার মধ্যে অস্তিত্ববাদের অর্থ নিহিত। অস্তিত্ববাদ দর্শনকে যথার্থ অর্থে বাস্তবায়ন করেছেন নিজের জীবনে, নিজেকেই তাঁর অভিমতের প্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাই অস্তিত্ববাদী ব্যক্তি মানুষের রূপ কেমন হবে এ সম্পর্কে বলতে গেলে সার্ত্রের ব্যক্তিগত জীবন পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, "সার্ত্রের চিন্তা ও আচরণে ছিল এক অখণ্ডরূপ, যেখানে প্রাণ পর্যন্ত পণ করা হয়, নিশ্চয়ই সাধারণ নয়। মানবঅস্তিত্ব এবং সমাজব্যবস্থা প্রথমে ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনার বিষয়, তিনি ছিলেন দর্শক।"[৪৪] এভাবে ব্যক্তি যখন নিজে দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে জগতের সকল ধরনের ব্যবস্থা এবং জীব, জড় ও মানুষের অস্তিত্ব, তখনই সে তার নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। তাইতো বাউলদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর, যাবি কোথায়? আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে, পড়বি ধাঁধায়। আবার এ মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন, লালন বলে পেয়ে ধন পারলাম না চিনিতে। ব্যক্তি তার নিজের স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও আত্মমর্যাদা তৈরি করতে তাকে আপন সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই হবে। এ আপন সত্তাই ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব। আর নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণের জন্য দরকার অনুকূল পরিবেশ, যার ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও আচরণ এক অভিন্ন রূপ লাভ করবে। সুতরাং ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব গঠন করার জন্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল্য অনস্বীকার্য হলেও এ অস্তিত্ব গঠনের অবভাসগুলো সম্পর্কে Timothy Clark বলেন, "…if existentialism could be summarized in three words, they might be freedom, responsiblity and authenticity. Existentialists claim that human beings have no predetermined purpose or essence laid down by God or nature**.** They are responsible for creating their lives according to their own values-and not by following the 'herd' by reflecting clearly on their situation and relationships and acting authenticity. "[45] এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, অস্তিত্ববাদের বিবেচনায় তিনটি বিষয় রয়েছে, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ ও যথার্থতা। অস্তিত্ববাদীদের দাবি হলো মানুষের পূর্বে থেকে কোনো ভাগ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে দেয়া হয়নি। ব্যক্তির তার মূল্যবোধ নিজেই সৃষ্টি করে। যথার্থতাকে কেন্দ্র করে সে এই কাজ করে থাকে। এখানে অস্তিত্ব ও জ্ঞানের বিষয়গুলো এক ও অভিন্ন। তাই অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সৃজনমূলক জ্ঞানের নিয়ম প্রযোজ্য। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির

---

[44] রবিন ঘোষ সম্পাদিত, ewIK msL¨v 2012, কলকাতা, ৪৬ বিজ্ঞাপনপর্ব, ১৪, হেয়ার স্ট্রিট, ৪০তম বর্ষ, পৃ. ৯৩।

[45] Timothy Clark, *Simone De Beauvoir,* London and New York, Routledge, 2004, p.14.

তার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে বিচারবিশ্লেষণ করে তার ভিতর থেকে যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানগুলো রয়েছে তা ব্যক্তি গ্রহণ করবে।

আমেরিকার প্রয়োগবাদী দর্শন মানুষের জৈবিক দিকের ওপর জোর দেয় এবং অস্তিত্ববাদীরা জৈবিক দিককে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্বারোপ করেন ব্যক্তির অনুভূতি ও আবেগকে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। অতএব দেখা যাচ্ছে, অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তির অস্তিত্ব সৃষ্টিতে স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করলেও স্বেচ্ছাচারিতাকে গ্রহণ করেনি; বরং স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বের বিষয়টিও যুক্ত করেছে। এজন্য অস্তিত্ববাদী Soren Kierkegaard ব্যাখ্যা করেন, "Each individual is free to choose a way of life, but this freedom is also a cause of 'angst' (anguish) because it constitutes a great responsibility. "[46]

অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তিমানুষের জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলেও ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের প্রকাশ পায় বিভিন্ন বিকল্পকে বিবেচনা করে সুনির্ধারিত জীবন পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে ব্যক্তির সামগ্রিক অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করবে এ নিয়ে তার মধ্যে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তবে সবাই এ বিষয়ে একমত হবেন যে, কোন বিশেষ পদ্ধতি বা পন্থা ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সফলতা এনে দেবে, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এর জন্য ব্যক্তির মনে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি আশঙ্কা বা উদ্বেগ থাকে। তাই ব্যক্তির অস্তিত্ব গঠিত হয় কর্মপন্থা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। শুধু চিন্তা বা শুধু কল্পনার মধ্যে অস্তিত্বের সামগ্রিক অনুভূতি সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন থাকে না এবং যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন নেই, সেখানে আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কর্মপন্থা স্থির করার জন্য যুক্তির প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা এবং সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করার অভিজ্ঞতার এ দিকগুলো সমানভাবে নেই। সুতরাং জীবনের যে পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতার পূর্ণ উপলব্ধি হয়, সেখানেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অন্য অস্তিত্ববাদীরাও মূলত অস্তিত্বের এ পরিচয়ে বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড বলেন, "An existing individual is constantly in process of becoming; the actual existing subjective thinker constantly reproduces this existential situation in his thoughts and translates all his thinking into terms of process. "[47]

অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তা অভ্যন্তরীণভাবে প্রতি মুহূর্তে বহু উদ্দীপক থেকে সম্ভাবনায় উদ্দীপক গ্রহণ করতে গিয়ে যে পরিস্থিতি শিকার হয়-তা থেকে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে চরম আবেগের সৃষ্টি হয়। এ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য

---

46 Loc. cit., p. 21.

47 Maurice Friedman, op. cit., p. 115.

তাকে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস ব্যক্তিকে কাজ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করে থাকে, এটিকে অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্ত বলা হয়। আমি যখন স্বেচ্ছায় কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করি, তখনই সম্ভাবনা হয়ে ওঠে আমার কাছে অস্তিত্ব। এ প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড আরও বলেন, "অস্তিত্বকে কখনো যুক্তি দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না; তাকে অনুভব করতে হয় জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রতি অভিজ্ঞতায়।"[৪৮]

অস্তিত্ববাদীরা মানুষকে স্বাধীন সত্তা হিসেবেই গ্রহণ করেন। কেননা একমাত্র মানুষ নিজেই তার ভ্রান্তিগুলো উপলব্ধি করতে পারে। অন্য কেউ তাকে সাহায্যে করতে পারে না। এ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে কোনো কারণে ব্যক্তি কোনো অপকর্ম করে বসে, এর সমস্ত দায়দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে। ধর্মকে বিশ্বাস করে ধর্মীয় জীবনযাপন করাটাই বড় কথা নয়, বরং বিশ্বাসকে নিজের চেষ্টায় অর্জন করতে হবে। সমস্ত ভাবাবেগ, সাফল্য-ব্যর্থতা ও বৈষয়িক জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই যথার্থ অস্তিত্ব। তাছাড়া ব্যক্তির যথার্থ অস্তিত্ব গঠিত হয়, যখন কোনো পরিবেশে কাজ করতে এগিয়ে আসে। তবে অস্তিত্বের প্রকাশ নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ও মার্টিন হাইডেগার দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্বের সাথে বেশি সম্পর্কিত সংকট বা উদ্বেগের। কিন্তু জাঁ-পল্ সার্ত্রে, কার্ল ইয়াসপার্স ও গ্যাব্রিয়েল মারসেলের দর্শনে ব্যক্তির স্বাধীনতাবোধের সাথে অস্তিত্ববাদ বিশেষভাবে জড়িত অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্যে, সংকট ও উদ্বেগ দূর করার জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা নামক সত্তার কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেহ ও মনের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক গ্যাব্রিয়েল ইয়াসপার্স স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, "দর্শনের ইতিহাসে বেশ কিছু সময় বিস্মৃত বা অবহেলিত ছিল এবং তা হলো সত্তার উৎসানুসন্ধান করা এবং আমি নিজেকে যেভাবে জানি বা আমার অন্তস্থ ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আমি যেভাবে সচেতন তার মাধ্যমে সত্তার উপলব্ধি।"[৪৯] এ থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তির মধ্যে যখন অন্তস্থ ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে আত্মকথন শুরু হয়, তখন ব্যক্তি বুঝতে পারে, মানুষ তো শুধু শরীর নয়, দেহ-মনের যুক্ত সমবায়। বস্তুত শরীর ও মনের সম্বন্ধ কী এবং কীভাবে তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ, তার ধারণা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় হয় না। কারণ বিজ্ঞান মানব-অস্তিত্বকে বাইরে থেকে দেখে এর মধ্যে শরীরকে যেমন একটি জড়বস্তু হিসেবে দেখে মনকেও সেরকম জড়বস্তুর কোনো বিশেষ বিকাশ ভাবে।

শরীর ও মনের যুক্ত মিলনে যে অস্তিত্বের অনুভূতি হয় তাকে মারসেল সত্তাগত রহস্য বলেছেন এবং সে রহস্যের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার শরীরের মধ্যেই আমার সত্তাকে খুঁজে পাই। এ প্রসঙ্গে জন ম্যাককিউরি (John

---

48 বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত সম্পাদিত, wK‡q‡KMvW, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১০৩।

49 ড. নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

Macquarrie) বলেন, "…for the existentialist the subject is the existent in the whole range of his existing. He is not only a thinking subject but an initiator of action and a centre of feeling."[50] তাই অস্তিত্ববাদীর অস্তিত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ওপর নির্ভরশীল হলেও এ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বস্তুগত মানসিকতার বিরোধী। এজন্য অস্তিত্বশীল ব্যক্তি বস্তুগত মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হবে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব্যক্তিমানুষের এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্তিত্বের মধ্যে যে চেতনা বিরাজ করে তা হতাশা ও মনস্তাপ। আর এ হতাশা ও মনস্তাপ তৈরি হয় চরম একাকিত্বের মাধ্যমে। তাই ব্যক্তি সত্তা নামক অস্তিত্বকে পুনরুদ্ধার করতে হলে ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীনতা ও একাকিত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবেই ব্যক্তির অস্তিত্বের সাথে জগতের ঐক্যতান সবই করায়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু যান্ত্রিক জগতের বর্তমান বিষাদময় জীবনে মানুষ বিভ্রান্ত, হতাশাক্লিষ্ট এবং ঐক্যচ্যুত। এ কাজে খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস খ্রিস্ট প্রচারিত চারটি পুণ্যকর্মের কথা উল্লেখ করেন। যথা: বিশ্বাস, আশা, প্রেম ও দয়া মানুষের জীবনে বিস্ময়, ঐক্য, অস্তিত্বের পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারে। অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে খ্রিস্টীয় দার্শনিকগণও আশার কথা বলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের দর্শনে ঈশ্বর ও মানুষের ব্যবধান এতই তাকে পীড়িত করেছে যে তিনি বলেছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে এবং আত্মসমর্পণ করতে হবে, কিন্তু সে বিশ্বাস ঝুঁকি ও হতাশার দ্বারা কণ্টকিত।

মার্টিন হাইডেগার তাঁর দর্শনে হতাশাক্লিষ্ট মানুষের অস্তিত্বকে বুঝানোর জন্য একটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটি হলো ডাজায়েন, যার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, "In examining the manner of Dasein's being in the world it becomes clear that it is essentially a kind of the world. In understanding Dasein as 'care' we seek its structure as falling and facticity. "[51] এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তির নিজস্ব জীবনের কাঠামো কীরূপ হবে তা ব্যক্তি সচেতনভাবে নিজেই নির্ধারণ করবে। এ জীবনের গতিধারা নির্ধারণ করতে যেয়ে বস্তুজগতের সাথে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে। প্রথমে, আমি দেয়ালে লোহা ঠুকে দেওয়ার জন্য হাতুড়ি ব্যবহার করি এবং সে অবস্থায় 'এটি হাতুড়ি' এ ধরনের বিচারমূলক বচন আমি উচ্চারণ করি না। হাতুড়িটাকে আমি হাতে ধরি এবং কাজে লাগাই। হয়তো হাতুড়িটা সম্বন্ধে আমার একটি অস্ফুট, অস্বচ্ছ ধারণা থাকে, যাকে হাইডেগার প্রাক-বাচনিক জ্ঞান বলেছেন, যে জ্ঞানে আমি অবাস্তব জগতের সাথে একটি নিবিড় মূর্ত সম্বন্ধে যুক্ত থাকি। কিন্তু বাচনিক জ্ঞান যখন লাভ করি,

---

50 John Macquarrie, *Existentialism*, New York, World Publishing Co. Ltd. 1980, p. 14-15.

51 Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology,* London and New York, Routledge, 2000, p. 238.

তখন এ মূর্ত পরিস্থিতির সজীবতা লাভ করি এবং স্বচ্ছ বচন-জ্ঞানে আমি হাতুড়িটাকে হাতুড়ি বলে জানি। প্রাক-বাচনিক স্তর থেকে বাচনিক স্তরে আসার সময় আমি দেখি, হয়তো হাতুড়িটা ভাঙা, কিংবা হাতুড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না, আবার হয়তো বস্তু হিসেবে অন্য কাজের বেলায় তা আমার বাধা সৃষ্টি করছে।

জাঁ-পল্ সার্ত্রের দর্শনে স্বাধীনতাবোধ এবং উদ্বেগের মধ্যে একটি যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি চেতনাকে বস্তু থেকে পৃথক করেছেন এবং বলেছেন, বস্তু সম্বন্ধে সদর্থক কিংবা নঞর্থক কিছুই বলা যায় না। বস্তু একটি অনড় অচলায়তন এবং তার নিজের কোনো সম্ভাবনা নেই। বস্তু কোনো কিছু হতে চায়, একথা আমরা বলতে পারি না। বস্তুর সারার্থ অনুভূত হয় ব্যক্তি যখন বস্তুর নিয়ে ভাবে, তখন বস্তুর সারার্থ ও বস্তুর সীমাবদ্ধ চেতনায় ধরা দেয়। শুধু তাই নয়, চেতনা পৃথিবীতে বস্তুগুলোকে একটি অবয়ব সংস্থান দিতে পারে এবং পৃথিবীকে সে অর্থময় করে তুলতে চায়। চেতনার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জাঁ-পল সার্ত্রে বলেন,

> "…and surely, if I now form an image of Peter, my imaginative consciousness includes a certain position of the existence of Peter, insofar as he is now at this very moment in Berlin or London. But while he appears to me as an image, this Peter who is in London appears to me absent. This absence in actuality, this essential nothingness of the imagined object is enough to distinguish it from the object of perception. "[52]

ব্যক্তি, বস্তু ও বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পর যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন পূর্ব অবস্থা সম্পর্কে চেতনায় প্রকাশিত হলে শূন্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়। সে বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায় না ঠিকই; কিন্তু ধ্বংসের তাৎপর্য বুঝা যায়। এখানে চেতনা দুই বাস্তবিক রূপকে তুলনা করার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের নেতিবাচক দিকটি উপলব্ধি করছে। সেজন্য চেতনার মাধ্যমে স্বাধীনতা উপলব্ধি করে ব্যক্তি জগতে নতুন করে সবকিছু গড়ে তোলে, পরিবর্তন আনে। অন্যদিকে, চেতনার অপর একটি রূপ স্বাধীনতার দ্বারাই মানুষ প্রথমে নিজেকে, তারপর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং সর্বশেষে জগতে পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়, স্বাধীনতার সাহায্যেই বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ব্যক্তির গুরুত্ব অনুসারে কর্মপন্থার মধ্যে যেকোনো একটিকে বাছাই করে। কেননা একই সাথে একাধিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর অপর একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হয়। তবে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে কোনটি ব্যক্তির অস্তিত্ব তৈরিতে সহায়ক তা বাছাই করা এবং তার সাথে কোন কর্মপদ্ধতি

---

[52] Jean-Paul Sartre, *Of Human Freedom,* Edited by Wade Baskin, NewYork, Philosophical Library, 1966. p.9.

সফলতা এনে দেবে তা পূর্ব থেকে না জানার কারণে ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাপ সৃষ্টি হয়। এজন্য মানবজীবন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বদাই মনস্তাপ দ্বারা তাড়িত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "Man is in his nature essentially realizes himself in being by standing ec-statically within the truth of being…"[53] এ উক্তি থেকে আরও যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো, ব্যক্তি তার নিজ প্রকৃতির মধ্যেই যে সত্য লুকিয়ে আছে সে সত্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। আর যদি সেই সঠিক সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই তার মধ্যে জন্ম নেয় মনস্তাপ। এজন্য ব্যক্তির স্বাধীন সঠিক সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না। তবে অনেক সময় আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা, ঈশ্বর কিংবা অতি-প্রাকৃতিক কোনো শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করলেও ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই আমরা গড়ে তুলি। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যক্তির নিজের চেষ্টায় তৈরি, যার মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব নিহিত আছে। নির্মাণাধীন অস্তিত্ব বা ভবিষ্যৎ দ্বারা আমরা মানবজীবনকে পরিচালনা করি। পরে সেই জীবনও একদিন আবার বিভ্রান্তিতে পরিণত অর্থাৎ অনস্তিত্বশীল হয়। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অর্থ বাস্তব পরিবেশ ও জগতের মধ্যে বাস করেও আমি যে বাস্তব পরিবেশ ও বস্তুর সাথে এক নই তা উপলব্ধি করা। যদি প্রশ্ন করা হয় কীভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলব? এর জন্য যেসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতাকে বস্তু মনে করে আমাদের অস্তিত্ব নির্মাণের জন্য স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করতে হয়। আর এ স্বাধীনতা আমাদের সহজাত হওয়ার কারণে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করি বা না করি, আমরা স্বাধীন হতে বাধ্য। তাই মানুষের জীবনের প্রকৃতিই হবে স্বনির্ধারিত নতুন নতুন পরিকল্পনা নেওয়া এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো। এটিই তার স্বাধীনতার প্রকাশ। মানবজীবনের অপূর্ণতা সারা জীবন ধরে চলে বিধায় কোনো স্তরেই ব্যক্তি বলতে পারে না যে তার সমস্ত কাজ শেষ। এভাবে সুনির্দিষ্ট কাজই মানুষের জীবনের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণ রূপ দিতে ব্যক্তি যে অনিশ্চিয়তর সম্মুখীন হয় তা থেকে ব্যক্তির ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়-যা থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি নেই। জাঁ-পল্ সার্ত্রে আবার ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। ভয় হচ্ছে বাইরের বস্তু যা আমায় ক্ষতি করতে পারে এ রকম আশঙ্কা করা। আর উদ্বেগ হচ্ছে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির নিজের স্বাধীন আচরণ এমন কিছু করে ফেলতে পারে যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো নিয়ন্ত্রণই নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট মনে হয় না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভয় ও উদ্বেগ সম্পর্কে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেছেন, "একটি সরু সেতুর ওপর দিয়ে আমি হাঁটছি। আমার পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই কারণ সুরক্ষিত লোহার বেষ্টনী আছে। তবু তা আমি কাছে গিয়ে খুব ঝুঁকতে

---

[53] Maurice Friedman, op. cit., 1964, p. 260.

পারি এবং তাহলেই পড়ে যেতে পারি। এই যে আমার স্বাধীন কাজ একটি নিশ্চিত ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে পারে, এতেই উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।"[৫৪]

ব্যক্তির স্বাধীনতা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বা অস্তিত্বের সাথে জড়িত হলেও স্বাধীনতার উপলব্ধি আসে চেতনার মাধ্যমে। মানুষ স্বাধীন বিধায় পৃথিবীতে মন্দ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে। ভাল কিছু করার দায়িত্ব মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ হিসেবে আমার ওপরও বর্তায়। তাছাড়া, পৃথিবীতে আমি পরিত্যক্ত এবং একা, এজন্য কৃতকর্মের সমস্ত দায় মানুষকেই বহন করতে হয়। পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে প্রকৃতির উপকরণ ব্যবহার করে নিজেকে সমৃদ্ধ এবং পৃথিবীর উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। তাই অস্তিত্ব নির্মাণে স্বাধীনতা কোনো কৌতূহলী চেতনা নয়; এ ধরনের চেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ অনেক সময় ভান করে যে, সে স্বাধীনভাবে কাজটি করেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মানুষের এরূপ প্রতারণাকে অচেতন বস্তুর সাথে তুলনীয়। সুতরাং অস্তিত্ববাদীরা মূর্ত আত্মসচেতন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না। কোনো মানুষ জনতা, সামাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব অনুভব করে, আর এ অনুভবই ব্যক্তির অস্তিত্ব। এ অস্তিত্ব ধারণ করে যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে তাকে বলে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি।

54 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

1.3 kb¨Zv I A¯ÍZ

ব্যক্তির চেতনার সংস্পর্শে শূন্যতার উপলব্ধি আসে। মানুষ যে অবস্তু বা পুর-সোঁয়া তার একমাত্র প্রমাণিত কারণ হচ্ছে শূন্যতা। তাই চেতনা নামক বৃত্তি যখন কোনোকিছু পাওয়ার বা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন সেটিকে বলা হয় শূন্যতা। অর্থাৎ ব্যক্তি চেতনা দ্বারা যা হয়নি বা যা এখনো পায়নি এরকম কোনোকিছুর অভাববোধ অনুভব করাই হচ্ছে শূন্যতা। এককথায়, শূন্যতা হচ্ছে ব্যক্তির কোনোকিছুর অভাব বা কোনোকিছু হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। এজন্য কোনোকিছুর অভাববোধ করা বা কোনোকিছু হয়ে ওঠার কামনা করা ব্যক্তির মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি করে তা পূরণ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। একসময় সে যখন তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেয়ে যায় অর্থাৎ সম্ভাবনাময় বস্তুটি বাস্তবিক রূপ লাভ করে তখন তাকে বলে অস্তিত্ব। অর্থাৎ সম্ভাবনাময় জগৎ হলো শূন্যতার জগৎ আর এ জগৎকে বাস্তবে পরিণত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্য অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে Jaques Maritain বলেন, "Essence is that which a thing is; suppositum is that which has an essence, that which exercises existence and action-actions sunt suppositorum-that which subsists. "[55]

যেমন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ একজন ডাক্তার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন তার মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। আর এ ডাক্তাররূপ সম্ভাবনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ডাক্তার হওয়াকেই বলে অস্তিত্ব। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সম্ভাবনাময় ডাক্তার হওয়ার থেকে বাস্তবিক ডাক্তার হয়েছে, তখন সেটিকে বলে অস্তিত্ব। জাঁ-পল্ সার্ত্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো, 'Le Ere Et Le Neant'-যার ইংরেজি অনুবাদ 'Being and Nothingness' এ গ্রন্থেই তিনি শূন্যতা ও অস্তিত্ব নামক ধারণা প্রবর্তন করেন এভাবে যে,

> ... The appearance does not hide the essence, it reveals it; it is the essence. The essence of an existent is no longer property sunk in the cavity of this existent; it is the manifest law which presides over the succession of its appearances, it is the principle of the series…But essence, as the principle of the series, is definitely only the concatenation of appearances, that is, itself an appearance. This explains how it is possible to have an intuition appearance.[56]

জাঁ-পল্ সার্ত্রের এ ধরনের ধারণা মূলত নার্সিসাস মননশীলতার ফসল। তিনি একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন এবং তার 'শূন্যতা' ও 'অস্তিত্ব' এ দুটি ধারণার সফল ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

---

55 Jaques Maritain, *Existence and the Existent*, New York, Pantheon Books, 1973, p. 62.

56 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, op. cit., p. 90.

শুরুতে তিনি বলেন, মানুষ কোনো পূর্ব নির্ধারিত অস্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নিজ সত্তাকে গড়ে তোলে। এজন্যই সার্ত্রের একটি প্রধান উক্তি, 'অস্তিত্বই বা ব্যক্তিসত্তাই সারসত্তার আগে এবং সারসত্তা অস্তিত্বের আগে নয়'। বলা বাহুল্য, এ অস্তিত্ব ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব, যদিও সে অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বস্তুজগতের অস্তিত্বের কথাও বলেছেন। তাই সার্ত্রের সমগ্র দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যক্তিমানুষ সংগ্রাম করে প্রচলিত রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, প্রথা, সংকট ও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে। এ প্রতিকূল পরিবেশই ব্যক্তি সর্বদা হতাশা তাড়িত এবং উদ্বেগের দ্বারা সর্বদা আন্দোলিত করে। এ অবস্থা থেকে ব্যক্তি নিজ প্রতিনিধিত্বকারী সত্তার নির্দেশে আবার ফিরে এসে শূন্য অবস্থান থেকে বিশাল বিশ্বাস নিয়ে কর্ম সম্পাদন শুরু করে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্মাণ করে। এ প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক Karl Jaspers-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Man cannot endure the fundamental attitude of nihilism, however. In the situation of universal lack of faith man succumbs rather to a blind faith. Such a faith is an immense substitute, is fragile, suddenly discarded again; it may embrace the most singular contents; it may be, as it were, an empty faith of mere motion. "[57]

জাঁ-পল্ সার্ত্রে শূন্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ, ব্যক্তির সাথে সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক, ব্যক্তির নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার ক্ষমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জীবনের চরম লক্ষ্য, মানবজীবনে ব্যক্তিমানুষের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং তাতে ব্যক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। আর অস্তিত্ববাদী দর্শনে অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, সব ধারণা যখন ভাবনা স্তরে থাকে তখন তা সম্ভাবনাময় অবস্থায় থাকে। আর যখন তা প্রকাশিত রূপ লাভ করে তখন সেটাকে বলা হয় অস্তিত্ব। আর এ অস্তিত্বের সাথে যে বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তা হচ্ছে শূন্যতা। জাঁ-পল্ সার্ত্রে 'অস্তিত্ব ও শূন্যতা' সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলেন,

> ...for example, has distinguished in its internal texture the negative act of judgment from the affirmative act. In each case a synthesis of concepts is operative, that synthesis, which is a concrete and full event of psychic life, is operative here merely in the manner of the copula is and there in the manner of the copula is not. In the same way the manual operation of sorting out

---

57 Karl Jaspers, *The Origin and Goal of History*, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1953, p. 143.

(separation) and the manual operation of assembling (union) are two objective conducts which possess the same reality of fact.[58]

এখানে সার্ত্রে শূন্যতার ধারণাকে নঞর্থক, অসার ও অলীক অর্থে ব্যবহার না করে, বরং সদর্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন-যার মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ একাকিত্ব উপলব্ধি করে এবং যা মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা একেবারে পরিত্যাগ করে নিজের ভবিষ্যৎ কোথায়-তা বুঝে কাজে অগ্রসর হয়। এতে ব্যক্তিমানুষ নিজের স্বরূপ ও নিজের সঠিক অনুভূতি উপলব্ধি করে। এ শূন্যতা ব্যক্তিমানুষকে সব প্রকার অচেতন ও ভোগ্য বস্তু থেকে পৃথক করে; মনের লোভনীয় নেতিবাচক অনুভূতিকে ধ্বংস করে, যা সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে ঐক্য স্থাপনকারী একটি ধারণা হিসেবে কাজ করে। এখানেই সার্ত্রে অস্তিত্ব ও শূন্যতার ধারণাকে স্বাধীন নির্বাচনের সাথে ব্যাখ্যা করে বলেন, "নির্বাচন না করাও নির্বাচন করা এক অর্থে, নির্বাচন করা সম্ভব কিন্তু যা সম্ভব নয়-তা হলো নির্বাচন না করা। আমি সবসময় নির্বাচন করতে পারি, কিন্তু আমার মনে রাখা উচিত যে, যদি আমি নির্বাচন না করি তাহলে তাও এক ধরনের নির্বাচন করা।"[৫৯]

মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা–যা সে হয়নি তাকে তা হতে হবে, এ হতে-হওয়ার চেতনাকেই সার্ত্রে বললেন শূন্যতা (Nothingness)। মানুষের মধ্যে শূন্যতা আছে বলেই সে তার অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যক্তিসত্তার অন্তরস্থিত অভাব পূরণ করার তাগিদে বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজের তাগিদ অনুভব করে। Jean-Paul Sartre বলেন, "…If the for-itself is to be the nothingness whereby there is being then being can exist originally only as totality. Thus knowledge is the world."[60] এখান থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিমানুষের চেতনার মধ্যে শূন্যতা বিরাজ করে থাকে। এ ধরনের সত্তাধিকারী ব্যক্তি মানুষ তার নিজস্ব অনুভূতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এজন্য যেমন কেউ তার অনুভূতি বুঝে সাহিত্য রচনা করে, কেউবা অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে থাকে। এ সংগ্রাম শক্তির চেতনাই ব্যক্তির শূন্যতা নামক বোধ দ্বারা তাড়িত। তাই জাঁ-পল্ সার্ত্রের ব্যক্তিসত্তার আচরণগুলো বিশ্লেষণ করলে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করা যায়। আর এ প্রকৃতি হলো 'না' বা 'শূন্যতা'। তবে মানুষের এ না বলা, যেটি শুধু মৌখিক স্তরেই প্রকাশ পায় না, বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যেও প্রকাশ করে থাকে। বস্তুজগৎ কখনো এ শূন্যতার ব্যাখ্যা না করলেও শূন্যতা উপলব্ধি আসে দুটি কাজের মধ্য দিয়ে তা একটি হলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়া এবং অপরটি হলো ধ্বংস। এ ধরনের শূন্যতা অবসান করতে পারে কেবল ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। এ শূন্যতা পূর্ণতার দিকে চলতে পারে কেবল নিজেকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা করে নিজের মধ্যে থেকে এর উত্তর

---

58 Ibid, p. 6.

59 ড. নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

60 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, op. cit., p.181.

খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। তবে এ চেষ্টা থাকবে ব্যক্তি সঠিক উত্তর পাওয়ার আগ পর্যন্ত। কেননা মানুষের দ্বারা গতানুগতিক সত্তার ধ্বংস সাধিত হয়ে থাকে। এভাবে ধ্বংস ও সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ নিজেকে গড়ে সঠিক মানুষ হিসেবে।

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, ব্যক্তিমানুষ নিজেই প্রশ্নকর্তা হিসেবে নিজেকে কার্যকারণ প্রবাহে আবদ্ধ রাখে। তা থেকে ব্যক্তি নিজেকে আলাদা করে আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে এ সত্তা নিত্য সম্ভাবনাময়ী সত্তা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, আর কোনো অবভাসিক বিষয়ে এ এক একটি প্রশ্নকে তোলার মধ্য দিয়েই জগতে একটি নঞর্থক অবধারণের আবির্ভাব হয়। আর এ নঞর্থক অবধারণ নিহিত ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে। ব্যক্তি তার নিজের প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। সার্ত্রে বলেন, "It is true that, at the same time, a full knowledge of our nature, based on inner experience, requires personal participation and that only thus does reality become entirely real to us. "[61]

শূন্যতা ইতিবাচক প্রভাবের ফলে ব্যক্তির মধ্যে উন্নত রুচিবোধ সৃষ্টি হয়। সে নিজস্ব আত্মসত্তার জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করে না। অর্থাৎ কোনো কাজ করা, কথা বলা, ধ্বংসমূলক আচরণ ও গঠনমূলক আচরণ করতে গেলে প্রথমে আত্মসত্তা স্বাধীন (অর্থাৎ সত্তাকে সকল প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত করে) হয়ে নীরব পরিবেশে গিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আত্মকথন শুরু করে, কেন এ কাজটি আমার জীবনের এত অপরিহার্য? না করলে আমার পরিণতি কী হতে পারে? এভাবে গঠনমূলক প্রশ্ন করার ফলে নিজের ভিতরকার সত্তা জাগ্রত হয়| ফলে ব্যক্তিমানুষ সঠিক ও জ্ঞানমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়া শূন্যতা থেকে অস্তিত্বের উপলব্ধি আসে বস্তুর ও ঘটনার নেতিবাচক দিক জানার মাধ্যমে। যেমন, ধরে নেওয়া যাক, বড়বাবু নামক এক ব্যক্তি, তার জীবনে অস্তিত্বের উপলব্ধি আসে এভাবে যে, ভোগবিলাসে ও সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে দিলে ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। বাবার সুখের মধ্যে জীবন কাটাতে দেখে হঠাৎ নদীপাড়ে এক বালিকার কণ্ঠে 'ওঠো বাবা, বেলা যায়' শুনে বড়বাবুর হুঁশ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ধন-দৌলত ভোগ সুখের জীবন ত্যাগ করে অস্তিত্বের গূঢ়তম অন্বেষণে যাত্রা করেন। এ হুঁশ হওয়ার ব্যাপারটা বুঝানোর জন্য অন্য রকম পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। যেমন, অনেক সময় আমাদের মধ্যে একজন লোক বদ্ধ দরজার বাইরে থেকে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে ভিতরের আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে। একেবারে ভুলে গিয়েছে নিজেকে, এমন সময় পিছনে কারো পায়ের শব্দ। চাবির গর্তে আত্মবিস্মৃত মানুষ মুহূর্তে হয়ে ওঠে

[61] Mary Warnock, op. cit., p.119.

সচকিত। এ সচকিত আপন অস্তিত্বের হুঁশ হয়ে যে আলোকিত উজ্জীবন জীবন লাভ করে সেটিকে আসল বেঁচে ওঠা বলে। এখানে ব্যক্তি ও বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় বস্তুর অবভাসের অন্তর্মুখী দিকগুলো অনুশীলন করে।

যদিও অজ্ঞতা ঘোচানোর জন্য ব্যক্তি প্রশ্ন করে, কিন্তু সে জানে না যে এর উত্তর কী হবে? যদি সদর্থক হয় তাহলেও এক ধরনের অসত্তা জন্ম নিবে, আর যদি নঞর্থক হয় তাহলেও এক ধরনের অসত্তা জন্ম নিবে। তাহলে প্রশ্ন উঠে, অসত্তা কী? এর উত্তরে বলা যায়, অসত্তা হচ্ছে এক ধরনের শূন্যতা? নিম্নোক্ত সার্ত্রের উক্তিটির মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে-

"...it is evident that non-being always appears within the limits of a human expectation. It is because I expect to find fifteen hundred francs that I find only thirteen hundred. It is because a physicist expects a certain verification of his hypothesis that nature can tell him. It would be in vain to deny that negation appears on the original basis of a relation of man to the world. "[62] এ উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, অসত্তা প্রত্যাশার স্তরে নিহিত থাকে বিধায় অসত্তার সাথে শূন্যতার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা অসত্তা সবসময় নেতিবাচক প্রত্যাশা থেকে সৃষ্টি। ব্যক্তির আশা ভঙ্গ হলেই এ অসত্তা সৃষ্টি হয়। অসত্তা ও আশাভঙ্গ এক ও অভিন্ন। এজন্য বলা হয় পৃথিবী হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের আশা ভঙ্গের জায়গা। এ আশা ভঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় শূন্যতা। আর শূন্যতার সাথে নেতিবাচক ধারণায় নিযুক্ত থাকার অর্থই স্বাধীনতাকে ভুলে থাকা। স্বাধীনতাই এ মিথ্যা আবরণকে ধ্বংস করে, ব্যক্তিকে যথার্থ অস্তিত্বে উন্নীত করে। এ প্রসঙ্গে সিমন দ্য বোভোয়ার বলেন যে, জাঁ-পল্ সার্ত্রে সত্তাকে অস্তিত্বের সাথে তুলনা করেছেন এভাবে যে, “আমার সত্তা একা, আমার সত্তা শূন্যতার মধ্যে একটি দ্বীপ, বাইরের হাওয়া তাকে আন্দোলিত করতে পারে না, বাইরের আবেগ তাকে মহাদেশ কিংবা মহাদেশের সন্ধান দিতে পারে না, কোনো চিন্তার বিদ্যুৎ আমার সত্তাকে শিহরিত করবে না। আমার সত্তা অজেয়, আমার সত্তা বহির্প্রকৃতির আবির্ভাবের বাইরে।”[৬৩] এখানে বুঝা যায় যে, শূন্যতার মধ্যে অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকে। সেটিকে ব্যক্তিসত্তা একাকিত্বভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করে থাকে। শূন্যতাকে যদি আমরা ধ্বংসের মাধ্যমে বিচার করে থাকি তাহলে বিচার প্রক্রিয়াটি চলে একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে কিংবা একটি টর্নেডোর মাধ্যমে। এ দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটে তা আসলে প্রকৃতির যাবতীয় উপাদানগুলো পুনর্বিন্যস্ত করে। ধ্বংসকে মেনে নিতে হলে একজন সাক্ষী থাকা দরকার। যে অতীতের বস্তুগুলো যেরকম ছিল, সেরকমভাবে তার স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে। বর্তমানের বস্তুগুলোর সাথে অতীতের বস্তুগুলো তুলনা করতে পারে, যে ঝড়ের আগে কী ধরনের উপাদান ছিল

---

62 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, op. cit., p.7.

63 সিমন দ্য বোভোয়ার, mwnZ¨ I ms¯'Z ˆÎgwmK cwÎKv; সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), কলকাতা, ৩৮/এ/১,নবীনচন্দ্র রোড, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ. ১১৫-১১৬।

ও পরে কী ধরনের উপাদান আছে এসব। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "একটি ঘূর্ণিঝড় যদি কয়েকটি জীবিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়, তাহলে এ মৃত্যুকে ধ্বংস বলা হবে, যদি সেরকম অভিজ্ঞতা হয়। ধ্বংসের অস্তিত্ব লাভ করতে হলে একজন মানুষের সাথে সত্তার সম্বন্ধের প্রয়োজন। অর্থাৎ একটি অতিক্রান্তি থাকা দরকার এবং সেই সম্বন্ধে সীমার মধ্যে এটি হওয়া দরকার যে মানুষ একটি সত্তাকে ধ্বংসযোগ্য বলে মনে করে। এতে একটি সত্তাকে সীমায়িত করা হয়, তার মধ্যে একটি কিছু কেটে ফেলা হয়। যেরকম আমরা সত্যের বেলায় দেখেছিলাম।"[৬৪] এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ধ্বংস ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতা মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিসত্তা বিবেচনা করতে পারে অতীতের নিজের অস্তিত্ব এবং বর্তমান অস্তিত্বের সাথে তুলনা করে। আমরা জানি যে, একজন বন্দুকধারীকে একটি লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছে, সে সতর্কভাবে তার বন্দুককে একটি দিকে তাক করে, অন্যসব দিকগুলো বর্জন করে। কিন্তু সে যদি একটু অসতর্ক হয় তাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এখানে এ অসতর্ক হওয়াকে ব্যক্তি অস্তিত্বের ধ্বংস রূপ বলা হয়েছে।

একটি সত্তাকে ভঙ্গুর বলা যায়, যদি তা তার অন্তরে অসত্তার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনাকে বহন করে। কিন্তু আর একবার একথা বলা যায় যে, মানুষের মধ্যে দিয়েই ভঙ্গুরতা আসে, কারণ যে বিশেষ সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আগে বলেছি তাই ভঙ্গুরতার শর্ত। একটি সত্তা ভঙ্গুর, সব সত্তা নয়, কারণ শেষেরটি সমস্ত ধ্বংসের ঊর্ধ্বে। এভাবে বিশেষ সীমাবদ্ধতার শর্ত নিয়ে একটি সত্তার সাথে যুক্ত হয় এবং সত্তার সাথে তার আদি সম্পর্ক এ সত্তার অভ্যন্তরে ভঙ্গুরতার প্রবেশ ঘটায় এবং সেটিই হলো অসত্তার স্থায়ী সম্ভাবনা। 'ধ্বংস' সম্পর্কে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "এটি বুঝা খুবই জরুরি যে, ধ্বংস একটি আবশ্যিক মানবিক ঘটনা এবং মানুষই ভূমিকম্পের মাধ্যমে তার নগরগুলোকে ধ্বংস করে কিংবা প্রত্যক্ষভাবেও তা করে থাকে। সে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে তার জাহাজগুলোকে ধ্বংস করে, অথবা প্রত্যক্ষভাবেও তা করে। কিন্তু একই সময় এটি জানা দরকার যে ধ্বংসের একটি প্রাক-অবধারণগত উপলব্ধির কথা বলে এবং শূন্যতার মুখোমুখি সেরকম একটি আচরণের সংকেত দেয়।"[৬৫]

আরো বলা যায়, যদিও ধ্বংস মানুষের দ্বারা সংগঠিত হয়, তবু তা একটি অবাস্তব ঘটনা এবং চিন্তা প্রক্রিয়া নয়। একটি ফুলদানির সত্তার ওপর ভঙ্গুরতার ছাপ দেওয়া হয়েছে এবং এর ভেঙে যাওয়া একটি সার্বিক ঘটনা, যা প্রতারিত করা যায় না। আমি কেবল তা যাচাই করতে পারি যা অসত্তার সত্তার মতো একটি অতিক্রান্তি আছে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে শূন্যতাকে অসত্তার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

> …we need only to consider an example of a negative judgment and to ask ourselves whether it causes non-being to appear at the heart of being or merely limits itself to determining a prior revelation. I have an appointment with

64 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

65 ঐ, পৃ. ১৪০।

> Pierre at four O' clock. I arrive at the cafe a quarter of an hour late. Pierre is always punctual. Will he have waited for me ? I look at the room, the patrons, and I say, "He is not here" Is there an intuition of Pierr's absence, or does negation indeed enter in only with judgment? At first sight it seems absurd to speak here of intuition since to be exact there could not be an intuition of nothing and since the absence of Piere is this nothing.[66]

এখানে জাঁ-পল্ সার্ত্রে শূন্যতার দৃষ্টান্ত বুঝানোর জন্য পিয়ার নামক একজন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এনেছেন। পিয়ারের অনুপস্থিতি হলো এক ধরনের শূন্যতা। সাধারণ চেতনা অবশ্য এ উপলব্ধি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। অতএব যা উপলব্ধির কাছে প্রদত্ত হয় যে, তা হলো এটিই যে, 'পিয়ের এখানে নেই'। এ অবধারণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি নিশ্চিত যে, পিয়েরের অনুপস্থিতি আমার এবং রেস্তোরাঁর মধ্যে একটি আদিতম সম্পর্ক স্থাপন করে। আরো অসংখ্য ব্যক্তি আছে, যাদের সাথে রেস্তোরাঁ কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ তাদের কোনো অবাস্তব প্রত্যাশা নেই। এতে তাদের অনুপস্থিতি ঘটে। কিন্তু ঠিক বলতে গেলে আমি নিজে পিয়েরকে আশা করেছিলাম এবং আমার প্রত্যাশা হলো পিয়েরের উপস্থিতি; আর প্রত্যাশাই নিজের মধ্যে অসত্তা সৃষ্টি করেছে। অনুপস্থিত পিয়ের রেস্তোরাঁকে আচ্ছন্ন করে আছে এবং তার আত্ম-বিলোপকারী সংস্থানের শর্তের ভূমি হিসেবে কাজ করে। বৈসাদৃশ্যের দিক থেকে আমি মজা করার জন্য আরো অনেক অবধারণ করতে পারি।

মানুষ নিজেই একজন প্রশ্নকর্তা বস্তু জগতে কোনো কিছু যখন নেই, এরকম অভিজ্ঞতা হয় মানুষ চেতনা দ্বারা শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করে উপলব্ধি করে যে, বস্তু পূর্ণ সম্ভাবনা এবং উদ্দেশ্য রহিত। বস্তুর নিজস্ব অর্থ নেই মানুষের দেওয়া অর্থ নিয়েই বস্তু অর্থময়। এ ধরনের একটি সাধারণ নেতিবাচক অবধারণের জন্যও জগতে অসত্তার সৃষ্টি হতে পারে। একজনের অনুপস্থিতির অসত্তার জন্ম হতে পারে। আমরা সার্ত্রে উপস্থাপিত পিয়ারের দৃষ্টান্তের অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা শূন্যতা নামক ধারণাটিকে আরো স্পষ্ট করতে পারি। যেমন, একটি মেয়ে বাড়িতে গৃহস্থালি কাজ করতো। কিন্তু একদিন স্বেচ্ছায় চলে গেল। এখন গৃহস্থালি কাজগুলো পড়ে আছে। সে কাজগুলো করার জন্য সে মেয়েটি নেই। কিন্তু যখন কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ঐ মেয়েটাকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে তখনই এক ধরনের অসত্তার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ মানবিক প্রত্যাশার মধ্যে অসত্তা নিহিত। এভাবে কারো অনুপস্থিতিতে নেতিবাচক অবধারণ সৃষ্টি হতে পারে। এ নেতিবাচক অবধারণ ব্যক্তির মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে। সুতরাং অসত্তা, শূন্যতা ও অস্তিত্ব জাঁ-পল্ সার্ত্রে অস্তিত্ববাদ দর্শনে একে অপরের পরিপূরক। কেননা মানুষ যখন সব ধরনের নেতিবাচক চিন্তাগুলো দূর করতে সক্ষম হয়, তখন তার মন হয় শূন্য। অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো ধরনের ক্ষোভ, লোভ, ভয়, হতাশা, দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ ইত্যাদি থাকে না। আর এ

---

[66] Jean- Paul Sartre, op. cit., p. 9.

নির্মল মন ও নির্মোহ অনুভূতিই ব্যক্তি মানুষকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে এবং সব কাজের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "কাজের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে, তখন এত নীরস যুক্তি তারা দেখাত যে সে যুক্তি সত্য না ঠেলে পারত না। যা-কিছু বাছবিচার তাদের, সেটিও তুলে ধরত, এমন এক আত্ম-সন্তোষের ভাবে যে তা যে তা আমায় বিব্রত না করে; বরং উন্নতই ধরতই, সে-সংঘাতগুলো ছিল মেকী, তাদের সমাধান করা হয়ে গেছে আগে থেকেই এবং একই সমাধান সব সময়। যখন নিজেদের ভুল তারা ধরতে পারত, তা তাদের বিবেকের ওপর চাপ ফেলত না।"[৬৭] যারা নিজেদের ভুলগুলো উপলব্ধি করে এবং তা দূর করতে আত্মশক্তি প্রয়োগ করতে পারে তারাই আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবকিছু বিচারবিশ্লেষণ করে আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এসব ব্যক্তিরাই শূন্যতা দূর করে নিজেদেরকে অস্তিত্বশীল করে তুলতে পারে।

67 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, শব্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

1.4 ¯Kvgagx Ans (bwmmvm gbbkxj Zv)

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁর স্বকামধর্মী অহং (নার্সিসাস ভাবনার) ফসল। প্রশ্ন ওঠে, স্বকামধর্মী অহং (নার্সিসাস) কী? স্বকামধর্মী অহং হচ্ছে ইগোসর্বস্ব চিন্তাভাবনা। এ ধরনের স্বকামধর্মী অহং সাধারণ মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেন না, তাঁরা চিন্তাভাবনার বা বিচারবিবেচনার মাধ্যমে যে মূল্যবোধ আবিষ্কার করেন তার প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই নিজের মূল্যবোধ তৈরি করেন। এ দিক বিবেচনায় সার্ত্রে একজন নার্সিসিস্ট গোত্রের। তবে তাঁর ভাবনাশক্তি ও জীবনদর্শন এ গোত্রের ভাবুকদের থেকে চোখে পড়ার মতো আলাদা। নার্সিসাস মানসিকতা গঠনের পিছনে Karl Jaspers একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য "... The state will again exercise dominion over culture and even give the latter a manifold new orientation on the lines of its own taste. Perhaps culture will, of its own accord, turn to the state for instructions. "[68]

এই উক্তির মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভব বিষয়টি জড়িত। যা নার্সিসিস্টদের মূল উপাদান। নার্সিসিস্টরাই শুভ গুণাবলি অনুশীলন করে ইগোর ওপর লিবিডোর (দৈহিক চাহিদা) প্রভাব কমিয়ে আনে, এর ফলে ক্রমানুসারে ব্যক্তি মানুষ নিজ দেহের চাহিদার ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে। 'ইগো' সবসময় বিশুদ্ধ আত্মসত্তা নির্দেশ পালন করে। এ বিশুদ্ধ আত্মসত্তা নির্দেশ পালন করতে করতে এক আশ্চর্যরকম প্রভাব পড়ে 'ইগো'র ওপর। আর ইগো বা অহং এর নির্বাচন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, সব বৈষয়িক বিষয়ের গুরুত্ব কমিয়ে 'ইগো' তখন যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে M. Heidegger বলেন, " Man…is not mere a living creature possessing among other faculties that of language. Language is rather the house of being man ec-sists dwelling there in as he guards the truth of being to which he belongs. "[69]

নার্সিসিস্টদের কাছে ভাষার ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ভাষাকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য হাইডেগার ব্যবহার করে না; বরং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভাষাকে ব্যবহার করেন। তাছাড়া যে ধরনের সত্য বাক্য মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে। যে ধরনের সত্যের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার প্রয়োজনীয়তা নার্সিসিস্টরা অনুভব করেন। যেমন, সার্ত্রে শৈশবে নিজের আনন্দের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন বড়দের এবং গুরুজনদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য। তাই তাঁর চেষ্টা ছিল বিনয়ী ভাষার ব্যবহারর মাধ্যমে কোমল স্বভাব প্রকাশ করা। যাতে বড়রা এবং গুরুজনরা তাঁর এ স্বভাব দেখে মুগ্ধ হয়। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় বিনয় স্বভাব অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেন। এ ধরনের কাজের ফলে যে সত্তা জাগরিত হয় সেটিই হলো নার্সিসিস্ট

---

68 Karl Jaspers, *The Origin and Goal of History*, op. cit., p.143.

69 M. Heidegger, Letter on Humanism, trans. by Edith Kren, Bren, A. Francke Verlag, 1947, p.79.

ব্যক্তিসত্তা। এ স্বকামধর্মী অহং মননশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তিসত্তা নিজের জন্মগত স্বভাব ও গতানুগতিক স্বভাবকে পরিত্যাগ করে অস্তিত্বশীল স্বভাব সৃষ্টি করে। যা ভোগীয় বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের দিকে তার অনুভূতিকে বা চিন্তাশক্তিকে চালিত করে ব্যক্তি একটি বিশেষ সত্য ও স্বভাব ধারণ করে, তখন তাকে বলে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তা। কেননা এ ধরনের স্বভাব সচরাচর কেউ ধারণ করে না, কেননা এটি ব্যক্তির স্বঅর্জিত, যা অপর ব্যক্তি শুধু মনোযোগ আকর্ষণ করবে না; বরং তার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি স্বভাব সম্পর্কে বাউলদের কণ্ঠে শুনি, রসিক যারা চতুর তারা, তারাই নদীর ধারা চিনে, উজান তৈরি বায়ে যারা, তারাই স্বরূপ সাধন জানে। স্বঅর্জিত ব্যক্তিসত্তার মূল্যবোধ ও নার্সিসাস মননশীলতা এক ও অভিন্ন। কেননা ব্যক্তিসত্তা একটি বিশেষ স্বভাব নির্বাচনের করে এবং সেই স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য বারবার অনুশীলন করে নার্সিসাস মননশীলতার অধিকারী হয়। এটিকে এক ধরনের পদ্ধতিও বলা যায়, যা দ্বারা ব্যক্তি তার উন্নত রুচিবোধ বা সুন্দর আচরণ তৈরি করে। নার্সিসাস ব্যক্তিসত্তা প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "In one of his summary definition of existentialism Sartre describes it as the doctrine which maintains the primacy of existence over-essence and which takes its start from man's subjectivity. Although his claim to have identified the common core of existential doctrine is repudiated by the other existentialists, this definition does capture the essential features of his own position."[70]

এজন্য বলা হয়, স্বকামধর্মী অহং এর মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকে। এ বিপরীতমুখী সম্পর্ক ব্যক্তিকে যথার্থ মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। মানবজীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তি অশুভ দিকগুলো অনুশীলন করে তারপর শুভ বা কল্যাণকর দিকগুলো। কল্যাণকরবোধ সৃষ্টি হয়, আত্মজিজ্ঞাসা কেন্দ্র করে ব্যক্তি নিজের শুভ-অশুভ গুণগুলো অবিরত পর্যবেক্ষণ করে। এভাবে ব্যক্তি নিজের তাৎপর্যময় অনুভূতিগুলো আলাদাভাবে বুঝতে পারে। এ আবেগগুলোর মধ্যে কোন অনুভূতিগুলো যথার্থ অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আবার কোন অনুভূতিগুলো তাকে অযথার্থ অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে; তা ব্যক্তি নিজেই উপলব্ধি করে। এ ধরনের মননশীলতা ব্যক্তিকে বিবেকবান ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী করে তোলে। এ প্রসঙ্গে Mary Warnock বলেন, "The positive side of this emphasis however, does lead to further valuable insights. The mystery of birth shows that we are unable to choose our existence; it is forced upon us. "[71]

নার্সিসাসরা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষ নিঃসঙ্গ ও একা। এজন্য নিজের মধ্যে শুভচিন্তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা বা নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য ঈশ্বর বা অতি প্রাকৃতিক সত্তা এবং অন্য কোনো মানুষের ভূমিকা অতি নগণ্য। কেননা একজন মানুষ স্বাধীন বিধায় সে এরকম ভাবতে পারে। এ

---

70 James Collins, *The Existentialists,* Chicago, Henry Regnery Company, 1968, p. 49.

71 Mary Warnock, op. cit., p.120.

স্বাধীন অহং এর কারণে বুঝতে পারে সে এক একটি স্বনির্ভর সত্তা। তাকে সব ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ফ্রয়েড এ প্রসঙ্গে প্যারানইয়ার শিকার ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, তারা খুব বেশি মাত্রায় আত্মসমীক্ষা করে থাকে, যাকে তিনি বলেন গোয়েন্দাগিরি। যেমন, গোয়েন্দারা মানুষের মধ্যে কোন মানুষ অপরাধী সেটি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসে এবং সেটি করতে গিয়ে সে আবার অনেক ঝুঁকিরও সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে, আমার 'আমি' নামক এক ধরনের সচেতন প্রবণতা নিজের ভিতরে প্রবেশ করে ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন করে অন্য সব ঘটনাকে অবজ্ঞা করে। ঐ সুনির্দিষ্ট ঘটনার ওপর মনোযোগ প্রদান করে তখন ঐ ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তার ভালোমন্দ দিকগুলোর বিশ্লেষণ করে নিয়ে আসে এবং এটি কেন এভাবে ঘটল এর প্রেক্ষাপট কী? আবার এটি অন্যভাবেও ঘটতে পারত। এভাবে সে ঘটনার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বের করে থাকে এবং সর্বশেষে উপাত্তগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘটনার মীমাংসা করে থাকে। Robin Morris and Geoff Ward বলেন,

> …It appears possible to explain the relatively common kinds of action errors that we make in our everyday life in terms of competition between and within currently appropriate (desired) and currently inappropriate (undesired, but somehow related) action plans. For example, the desire to turn right at the end of one's road to pick up a prescription may be captured by our familiar routine (although today inappropriate) of turning left to go to work. [72]

নার্সিসাস মননশীলতা অর্জন করতে তাকে কিছু শর্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। (ক) তাকে বিষয়সমূহের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করতে হবে এবং অন্য বিষয়গুলো সে মুহূর্তের জন্য অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে হবে। (খ) নীরব ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে থাকতে হবে। (গ) মন থাকতে হবে একবারে কুসংস্কার মুক্ত, নিরপেক্ষ ও নির্মোহ। (ঘ) বিষয়ের প্রতি থাকবে তীব্র অনুরাগ ও আত্মজিজ্ঞাসা। এসব শর্তগুলো নার্সিসাস দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা ছাড়াও গবেষণা ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও তথ্য বা প্যারাডাইম আবিষ্কার করতে সহায়তা করে । নার্সিসাস মননশীলতা মানুষের মধ্যে অতি অল্প হলেও জন্মগতভাবে প্রোথিত থাকে। তবে এটি প্রকাশ পায় যখন মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় বা অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়। এ সত্তা দ্বারাই ব্যক্তি আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মসমীক্ষা চালায় সংকট থেকে মুক্তি থেকে পাবার জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের কৌশল বা পথ খুঁজে পায়। যদিও সে কৌশল বা পথগুলো বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্বেগ দ্বারা তাড়িত করে তবে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সে তার অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই স্বকামধর্মী অহং অস্তিত্ব রক্ষাকারী সত্তা। এ সত্তার উপলব্ধি আসে নিজের সাথে অপরের তুলনার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে Gabriel Marcel বলেন,

---

[72] Robin Morris and Geoff Ward, op. cit., p. 92.

> ...This is not to question the reality of things but to specify that their existence is apprehended by incarnate beings like you and me, and by virtue of our being incarnate beings like you and me. And by virtue of our being incarnate. Now we can begin to see that these reflections have anthropological import, though the kind of anthropology in question would be philosophical or existential, not a science concerned with the objective characteristics and structure of human nature.[73]

নার্সিসাস ব্যক্তিমানুষ চিন্তার জগতে প্রবেশ করে আত্মজিজ্ঞাসার ও যথার্থ মানুষের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির মাধ্যমে নিজের ভিতরের মানবীয় গুণাবলি প্রত্যক্ষ করে এবং তা বাস্তব জীবনে অনুশীলন করে অসাধারণ মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে নার্সিসাস অনুভূতি সংকটের সময় বিষয় সম্পর্কে একনিষ্ঠ মনোযোগ তৈরি করে এবং আত্মসমীক্ষা চালাতে সাহায্য করে যা সাধারণ অনুভূতির ধরাছোঁয়ার বাইরে। যারা স্বশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিত হয়ে তাদের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন হলে এ ধরনের কাজ করে থাকেন। কিন্তু যারা অশিক্ষিত বা সাধারণ মানুষ তারা জানে না, তাদের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তাশক্তি আছে যার দ্বারা এ সংকট থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সার্ত্রে বলেন, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা নামক চেতনা একবার তৈরি হলে, সে যেকোনো সংকট থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে এবং সে সার্বিক সত্তা হিসেবে ঈশ্বরকেও অস্বীকার করে যেকোনো কাজ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে James Collins বলেন,

> It is God in the traditional Christian sense whom Nietzsche seeks to destroy with hammer blows of his dialectic. If a transcendent, immutable entity is admitted, there results a devaluation of the temporal sphere and a dichotomy between what merely appears and what truly is the practice is to identify true being with the systems and interests of the dominant group in a society.[74]

প্রকৃত অর্থে নার্সিসিস্টরা নিজেকে অবিরত পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে এরকম প্রবঞ্চনা কাজ করে তা একটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সার্ত্রের মতো নীৎসেও অনুভব করতে পেরেছিলেন। তবে সার্ত্রের মাতামহ ছিলেন একজন কঠোর বস্তুবাদী ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে, তাঁর মা ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং মা তাঁকে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী করে বড় করে তুলেছেন। কিন্তু তার উপর মাতামহের প্রভাব খুব বেশি থাকায় নিজে কখনো প্রবল ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠতে পারেননি। তিনি বলেছেন যে, ধর্মভাবনা তার কাছে একটি বিরক্তিকর বিষয়। কিন্তু তিনি একটি ক্যাথলিক

---

73 Gabriel Marcel, *The Existential Background of Human Dignity*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1963, p. 47.

74 Ibid., p. 22.

স্কুলে পড়াশুনা থাকা অবস্থায় ধর্মভাবনার ওপর কেন্দ্রীভূত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, যেহেতু তার রচনাটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে সেহেতু তিনি প্রথম স্থান অর্জন করবেন। সে বিচারে আসলে একজন ধর্মযাজক তাকে এ আঘাত দিয়েছেন তার কারণ হলো ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আরও অনুপ্রাণিত করার জন্য। কিন্তু এ আঘাত তাঁর নেতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং তাকে নার্সিসাস্ট ব্যক্তিত্ব তৈরিতে সহায়তা করে। যদিও নার্সিসাস্ট ব্যক্তিত্ব তৈরিতে করার সিদ্ধান্ত নেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে অনেক পরে।

সার্ত্রে স্বকামধর্মী অহং মননশীলতা উপলব্ধি একটি দৃষ্টান্ত প্রদান এভাবে একটার পর একটা শিশু সুলভ অপরাধ করতে থাকেন এবং সেগুলো গোপন করতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ ঈশ্বর আমাকে দেখতে পেলেন যে, আমি আমার হাতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে অনুভব করতে লাগলাম। তারপর ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ আমাকে রক্ষা করল যার ফলে স্বকামধর্মী অহং মননশীলতা উপলব্ধি করলাম। অস্তিত্ববাদী মানুষও নিজেকে অনুভবের মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি করেন। এ অবস্থায় আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবিত অর্জনের পরেও বর্তমান পরিবেশে এ বিশ্বব্যাপী মানব বিভীষিকার কারণ কী? এত বিত্তের মধ্যেও চিত্তের এ শূন্যতা কেন? এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায়ইবা কী? এসব সমস্যার সমাধান ও সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের নার্সিসাস মননশীলতার চর্চা করতে হবে। এ চর্চা বা অনুশীলন সকল মানুষের মধ্যে সার্বিক ঐক্য এবং অনাবিল প্রেমানুভূতি সৃষ্টি করবে ও সার্বিকভাবে মানব কল্যাণ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

2. Rv-cj mv‡Îi gvbeRxeb m¤úwKZ avivYv

2.1 gvbeRxe‡b †PZbvi cKwZ

জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তায় যে তিনজন দার্শনিক সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁরা হলেন, হেগেল, হুসার্ল ও হাইডেগার। এঁদের মধ্যে হেগেলের কাছ থেকে নিয়েছেন মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, হুসার্লের কাছ থেকে পেয়েছেন দার্শনিক পদ্ধতি এবং হাইডেগারের কাছ থেকে পেয়েছেন অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। হেগেলের মতে, মানবজীবন প্রতীপ (Thesis) ও বিপ্রতীপ (Antithesis) দ্বন্দ্ব এবং এ দ্বন্দ্বের সর্বশেষে সমন্বয়ের (Synthesis) মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে স্থিতি লাভ করে। আবার এ Synthesis থেকে Thesis এর উৎপত্তি হয়। মানুষের চেতনা তেমনি সাময়িকভাবে স্থির মনে হলেও সেই চেতনা আবার নতুন অভাববোধ দ্বারা তাড়িত হয়। মানুষ কখনো তার শূন্যতাকে চেতনার কারণে ভুলে থাকতে পারে না বিধায় মানবজীবন স্থির নয়; বরং সর্বদা অভাববোধ বা শূন্যতা দ্বারা পরিচালিত হয়। জাঁ-পল্ সার্ত্রে মানবজীবনে বস্তুজগতের যে দ্বন্দ্ব তা কীভাবে চেতনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় তা হেগেলের কাছ থেকে লাভ করেছেন। আর হুসার্লের কাছ থেকে যে পদ্ধতি লাভ করেছেন তা অভিজ্ঞতালব্ধ উপকরণ যাকে হুসার্ল বলেন, অবভাস (Phenomena)। মানবজীবনের চেতনাকে অবভাস থেকে পৃথক করা যায় না বিধায় চেতনা সবসময় বস্তুমুখী বা বিষয়মুখী। মানুষের সুপ্ত সহজাত সত্তা হিসেবে চেতনা হচ্ছে কোনো না কোনো বিষয়ের চেতনা। এজন্য হুসার্লের এ তত্ত্বকে উদ্দেশ্যবাদ (Theory of intentionality) বলেছেন। এ চেতনার নির্দেশনা সম্পর্কে হাইডেগার আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলেন, মানুষের চেতনা সব সময়ই নিজের গণ্ডি পেরিয়ে জগতের সাথে যুক্ত হয়। এজন্য বলা হয় মানুষের অতিক্রমণ (Transcendence) ক্ষমতা আছে। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে এবং সেসব কিছুকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে M. Heidegger বলেন, "…Absolutely mystery, mystery as much as such (dissimulation of the dissimulated), pervades the whole of Man's Da-sein. He is the more mistaken the more exclusively he takes himself as the measure of all things. "[75]

ব্যক্তিমানুষ জগতের সাথে সম্পর্কিত বিধায় মানবজীবনের ঘটনাবলিকে বাদ দিয়ে তার স্বরূপ সত্তাকে বুঝা যায় না। এ কারণেই হাইডেগার মানুষকে জগৎ-মধ্যস্থ-সত্তা বলেছেন। এ জগৎ-মধ্যস্থ-সত্তা চেতনার সাথে সম্পর্কিত হয়ে জগতের সবকিছু জানতে পারে। যেমন, নিজের বা অপরের ভালোমন্দ দিক সম্পর্কে জানে এবং

---

[75] M. Heidegger, *Existence and Being*, op. cit., p. 313.

বস্তুর সক্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে, বিষয় বা নিরেট বস্তু (আঁ-সোঁয়া) থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে এবং বৃহৎ আমি সত্তার সাথে একত্রিত হয়ে নিজেকে অনুভব করতে পারে। এক কথায়, চেতনা হচ্ছে জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে জানার জানালা। জাঁ-পল্ সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনে চেতনাকে তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন,

> His philosophy also helped him immensely in his theatrical projects, since it is concerned with the individual and his consciousness in specific situations rather than metaphysical abstractions. The three modes of consciousness Being-in-itself, Being-for-others, Being-for-itself, the question of choice, commitment, Bad faith and bove all, the inescapable anguish of existence all this is suitable material for theatrical representation.[76]

চেতনার মাধ্যমে উক্ত তিনটির মধ্যে স্বহেতু সত্তাকে (Being-for-itself) মানবজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয় করেছেন। চেতনার প্রকৃতি নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া, চেতনা যা সে নয়, তাই হতে চাওয়া। তবে চেতনা তখনই নিজের বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম করবে যখন ব্যক্তি যে চেতনার মধ্যে আছে তার অধিকতর যুক্তিসংগত চেতনা লাভ করবে। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে যখন কষ্ট । হতাশা আসে তখন সে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে যাতে তার ভিতরের সব কষ্ট দূরীভূত হয়। কিন্তু তার চেয়ে উচ্চ বা যুক্তিসংগত ইতিবাচক চেতনা হলো এ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করে যদি সে সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে কষ্ট ও হতাশাকে অতিক্রম করে নিজেকে অস্তিত্বশীল মানুষ বা অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে তাহলে তার একদিকে নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি হলো এবং অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পত্তির অধিকারী লাভ করা হলো। এভাবে একটি চেতনা অপর চেতনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। কেননা যে চেতনা মানুষের ভিতরে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে আবার সে চেতনার অপরদিকে যুক্তিসংগত যন্ত্রণা পরামর্শের মাধ্যমে হ্রাস করে মানুষকে অস্তিত্বশীল করে তোলে। চেতনা সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করলেও সে কোনো বিষয়ের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি দিক সম্পর্কে পরখ করতে সচেতন। চেতনা যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গতিময় ঐক্যে অস্তিত্বশীল, তার কারণ চেতনা স্বাধীন। তাই চেতনা অতীত সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে থাকে এবং চেতনার উপাদান হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে Mary Warnock বলেন, "The emphasis on the personal, important as a way

---

[76] Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha , op. cit., p. 113.

of directing our experience, becomes distorted when it is used to isolate the existence of the individual from that of any other person or thing. "[77]

অস্তিত্ববাদী দর্শনে চেতনার ধারণা ব্যাখ্যা করে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "চেতনা এমন একটি সত্তা, যার প্রকৃতিই হলো নিজের শূন্যতাকে উপলব্ধি করা। চেতনা, তিনি মনে করেন, জগতে উপস্থিত হয় একটি না হিসেবে যে না-এর অনুভূতির মধ্য দিয়ে ক্রীতদাস তার প্রভু সম্বন্ধে সচেতন হয়। যে আচরণের মধ্য দিয়ে মানবসত্তার নেতিবাচক ক্রিয়াটি নিজের প্রতিই নির্দেশ করে, জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাকে বলেছেন মিথ্যা বিশ্বাস।"[৭৮] এ বিশ্বাস 'না' বা 'শূন্যতা'র মাধ্যমে সার্ত্রে চেতনার প্রকৃতি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। চেতনা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে প্রকাশ করে। একটি উদাহরণে সার্ত্রে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন,

> একজন তরুণী পুরুষ বন্ধুর সাথে বেড়াতে বেরিয়েছে। তরুণীটি পুরুষ বন্ধুর উদ্দেশ্যটি জানে, কিন্তু যখন তার বন্ধু তার হাতের ওপর হাত রাখে, সে ভান করে যে হাতটি তার নয়। কিন্তু তাকে এখনি একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে সিদ্ধান্ত নেবার সাহস নেই। হাতটি যদি যেমন আছে তেমন রেখে দেয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রেমে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে তার সম্মতি আছে। আর যদি হাতটি সরিয়ে নেয়, তার অর্থ হবে, যে মধুর মুহূর্তটি গড়ে উঠেছিল, তাকে নষ্ট করে দেওয়া। সিদ্ধান্তটিকে আরও পিছিয়ে দেওয়া দরকার। তরুণীটি এখন সম্পূর্ণ যুক্তির স্তরে উঠে যায় এবং আবেগ-বর্জিত হয়ে সে জীবনের আদর্শ ও আরও বড় বড় কথা বলে। এভাবে তার দেহ ও মনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। হাতটি কিন্তু একটি অচেতন বস্তুর মতো সর্বক্ষণ আর একটি উষ্ণ হাতের মুঠির মধ্যে রয়েছে। এটিকে সার্ত্রে বলতে চান তরুণীটি মিথ্যা বিশ্বাসের শিকার।[৭৯]

এখানে মিথ্যা বিশ্বাসের মাধ্যমে জাঁ-পল্ সার্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীন চেতনা কীভাবে অপর ব্যক্তির চেতনাকে অন্যদিকে পরিচালিত করে এবং ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে পারে তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সার্ত্রে চেতনাকে স্বাধীনতা ও শূন্যতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা বিশ্বকে যুক্তিগতভাবে জানা চেতনার ওপর নির্ভর করে। মানুষ সসীম বলে শূন্যতা রূপেই চেতনার জগতে আবির্ভূত হয় এবং একে যুক্তিহীন মনে হলেও চেতনা দ্বারা এ জগতে সবকিছু অর্থযুক্ত হয়ে প্রত্যেক জিনিস নিজের কাছে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। এ কথাটার অর্থ, আমরা বেঁচে থাকি চিরন্তন অবিনাশী শূন্যতা রূপেই। এ জগতের সমস্ত কিছু অর্থহীন, তবে ব্যক্তিমানুষ তার নিজ প্রয়োজনে জগতের সাথে যুক্ত হয়ে জগৎকে অর্থময় করে তোলে। স্বভাবতই এ জগতের বিভিন্ন ঘটনা, বস্তু, মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ সম্পর্কে আমরা জানি এবং এসব ঘটনা, বস্তু, মানবেতর প্রাণী,

---

77 Mary Warnock, op. cit., p. 12.

78 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, 'kb I mwnZ¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

79 ঐ, পৃ. ৮৯।

উদ্ভিদ ও মানুষের ভিতরের সত্তাকে আবিষ্কারের সাথে সাথে আমরা নিজেকেও আবিষ্কার করি। কিন্তু অন্য প্রাণীর জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করতে পারে না। কেননা তারা জানে না জগৎ বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে এবং জগতে তারা জীবিত। ব্যক্তিমানুষ ছাড়া অন্য সব ধরনের ঘটনা, বস্তু উদ্ভিদ ও প্রাণী এ জগতে আঁ-সোঁয়া। মানুষের ভিতরে চেতনা আছে বলে সে জগতে কোন বস্তুটি কতটুকু অস্তিত্ব ধারণ করে আছে এবং কোন প্রাণী কী ধরনের আচরণ করে তা বুঝতে পারে। তাই জগতের সব অস্তিত্ব ও সত্যের সৃষ্টি ধারক হচ্ছে চেতনা। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "চেতনা হচ্ছে তীরের মতো, যা মানুষের দিকে ধাবিত হয়ে অন্য বস্তুর দিকে যাচ্ছে এবং যার দ্বারা মানুষ বস্তু সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।"[৮০]

জাঁ-পল্ সার্ত্রের মতো দেকার্তও মনে করতেন, মানুষ পূর্ণ নয়, মানুষের সসীমতাই তার যেন পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। আবার দেকার্ত মানুষের স্বাধীনতাকে নৈতিকতার সাথে যুক্ত করেছিলেন। স্বাধীন মানুষ অসত্যকে অস্বীকার এবং সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা রাখে। যার মাধ্যমে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তার নাম চেতনা। যদি ব্যক্তি মানুষের মনে দুষ্ট মনের প্রভাব বেশি থাকে তবে সে অন্যায় কাজ করার দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। এ ধরনের চেতনাকে সার্ত্রে স্বাধীন চেতনা বলতে নারাজ। কারণ সেগুলোর সাথে অসত্যের সম্পর্ক আছে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এদের সম্বন্ধে সার্ত্র বলেছেন, প্রথমত এটি নেতিমূলক এবং স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু এর কাজ ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যা থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে, মানুষের স্বাধীনতা ইতিবাচক, কিন্তু ইচ্ছা যখন তার স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বুদ্ধির পূর্ণ স্বচ্ছতা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন চেতনা দ্বারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি খাঁটি উপলব্ধি হয়।

জাঁ-পল্ সার্ত্র মনে করতেন, মানুষের চেতনার বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ হবে স্বায়ত্তশাসনের মতো যাতে মানুষ মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত না হয়ে সে যা আছে তাকে অস্বীকার করে নতুন কিছু গড়তে পারে। তাঁর মতে, "…Consciousness conceals in its being a permanent risk of bad faith. The origin of this is the fact that the nature of consciousness simultaneously is to be what it is not and not to be what it is. "[81] এ দ্বারা বুঝা যায়, মানুষই চেতনার বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু সে জানে আসল বিষয়টি কী, এ ধরনের আসল বিষয়টি লুকিয়ে মিথ্যা বিষয়টিকে প্রকাশ করে থাকে এবং চেতনা প্রকৃতিতে যা আছে তা পরিত্যাগ করে, যা নেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে বস্তুজগতে অনেক কিছু আবিষ্কার করে। এ আবিষ্কার করতে গিয়ে জগতে 'না' এর আবির্ভাব হয়। মানুষের চেতনাই ব্যাখ্যা করতে পারে কেন জগতে 'শূন্যতা' বা 'না' আছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে চেতনা ব্যক্তির শূন্যতা ও অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে তাকে বলে

---

80 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

81 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, op. cit., p. 70.

স্বাধীন চেতনা। কেননা চেতনা স্বাধীন হলে সে তার অন্তর্মুখী পদ্ধতি দ্বারা সব ধরনের বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় ও ঘটনার সারার্থ এবং তার প্রায়োগিক অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া সে নিজেকে অতীত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থেকে আলাদা করতে পারে; সবসময় বর্তমান কর্ম সম্পাদন করে নিজেকে অস্তিত্বশীল করে রাখতে পারে। এ অবস্থাকে সার্ত্রে তাঁর আলংকারিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কেননা আমরা চেতনাকে স্বাধীনতা দ্বারা ভালোভাবে বুঝে কাজের উদ্দেশ্য ও গঠনকে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করি। যেকোনো কাজের মধ্য দিয়ে চেতনা যা নয় সে দিকে এগিয়ে যায় এবং যা আছে তা কখনোই যা নেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কল্পনা বা অবাস্তব অবস্থা কখনোই চেতনার বিশেষ পরিণতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "চেতনা যা কিছু জানে, কিছুই চেতনার মধ্যে নেই। প্রত্যক্ষকের বিষয় যে বস্তু তা বাইরের জগতে আছে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, ... কল্পনার চেতনার মধ্যে কোনো মানসিক প্রতিরূপের আবির্ভাব হয় না, যা কল্পনার বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে তা বুঝতে অসুবিধা হয়; বরং তিনি বলেন, কল্পনার বস্তুর বাইরের জগতে কিংবা চেতনার বাইরে কোথাও আছে এবং তা চেতনার কাছে বর্তমানে অনুপস্থিত, কিন্তু চেতনার সাথে এ অবর্তমান বস্তুর সম্পর্কই কল্পনা।" [৮২]

চেতনার যে ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে তা দিয়েই কল্পনা বা অবাস্তব অবস্থাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং বাস্তবতার চেহারা চেতনায় উপলব্ধি করে প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে G. J. Warnock বলেন, "…Our first problem is to evaluate the argument from illusion. From the unexceptionable promises that things are not always what they appear to be and we cannot always tell, there and then, whether they are or not, it is concluded that we have direct knowledge only of appearances, never of objects. "[83]

ব্যক্তি, অপর ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি অধিক আসক্ত হলে চেতনা সেই বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করতে পারে না। তাই চেতনা নিজের আসক্তি থেকে এবং লোভনীয় জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একেবারে নিরপেক্ষ হয়ে যে সত্তা তৈরি করে সেটিই অস্তিত্বশীল সত্তা। যেমন, একজন শ্রমিক নিজের অবস্থাকে অসহনীয় মনে করতে পারে এবং ফলে সেটিই তার বিপ্লবী কর্মের প্রেরণা হতে পারে। চেতনার অতীত থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটি চিরন্তন সম্ভাবনা আছে এবং এ মুক্ত অবস্থা প্রকাশ পায় অতীতকে ধ্বংস করার মধ্যে। ভবিষ্যতে যে কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হবে, তার দ্বারাই অতীত ও বর্তমানকে অর্থ দেয়া হয়। প্রতিটি কাজেরই

---

82 জাঁ-পল্ সার্ত্রের A¯ÍZev‘ I gvbeZvev‘, ভাষান্তর, মৃণালকান্তি ভদ্র, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ৮০।

83 G. J. Warnock, *The Philosophy of Perception*, London, Oxford University Press, 1977, p. 66.

একটি উদ্দেশ্য আছে এবং উদ্দেশ্যকে কারণের প্রসঙ্গে বুঝতে হবে। আমার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য একটি কারণকে নির্দেশ করে যে কারণের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যটিকে কল্পনা করা যায়। ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে এবং বর্তমান হচ্ছে কাজের আবির্ভাবের মুহূর্ত। যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজের কথা চিন্তা করা অর্থহীন।

চেতনা সত্তাকে প্রেষণার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে এবং ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে। অনুরূপভাবে, আমরা যদি প্রকল্পের পিছনে-সামনে এবং বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে প্রকল্পের অবয়ব গঠন করতে পারি। কাজের উপকরণ, প্রেষণা এবং উদ্দেশ্য সবগুলো দ্বারাই একটি প্রকল্প গঠিত হয়। এ তিনটির প্রত্যেকটিই অন্য দুটিকে নিজের অর্থের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে। কিন্তু তিনটির একত্র সংগঠিত সমগ্র কাঠামোটিকে কোনো একটি গঠন দিয়ে বুঝা যায় না এবং যে প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে তা অচেতন বস্তুর যা ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে ধ্বংস হয়।

প্রায় সব অস্তিত্ববাদীদের বক্তব্য চেতনাই হচ্ছে সেই সত্তা যার জগৎ সবসময় বর্তমান থাকে। এখানে জগৎকে ব্যক্তির নতুন আশা ও উদ্দীপনা ও আত্মার ভিতরকার শক্তি দিয়ে নতুন চিন্তা তৈরি করাকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে Robin Morris and Geoff Ward বলেন, "It has been a wonderful year with a new life, new strength, new hope…I need firmly to convince myself that I am not really slow, nor stupid, not incapable… and the rest will come. "[84]

চেতনার প্রকাশের আরেকটি দিক হলো চিন্তন। চিন্তন জগতের বাস্তব পরিস্থিতির কারণ হতে পারে। চিন্তাকে যখন কোনো বিশেষ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়-তখন বর্তমান বৈষয়িক অবস্থানে দশাগ্রস্ত ব্যক্তি সত্তা বিরাজ করে না। কেননা কর্ম পরিকল্পনার সময় সম্ভাবনার চেতনার আবির্ভাব হয় এবং দশাগ্রস্ত অবস্থা অবসান ঘটে। যেমন, উদ্দেশ্যের আলোকে জগতে থাকাটাকে সম্ভব এরকম চেতনা ব্যক্তি ধারণ করে প্রতিটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে সে ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ। তাই অভিজ্ঞতাকে বলা হয় ব্যক্তির স্থির চেতনা। এজন্য বলা হয় চেতনা উপলব্ধি হয় ঘটনার কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে। কিন্তু একই সাথে চেতনা আবার যে প্রকল্পটিকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাহলো একটি জগতের থাকাটাকে চেতনা সম্ভব করে। এর অর্থ হলো, চেতনার মাধ্যমে প্রেষণা তৈরি হয়। কারণ প্রাথমিকভাবে চেতনা প্রকল্পকে উপলব্ধি করে ঠিক যে মুহূর্তে, সে মুহূর্ত থেকে জগতের অবাস্তব সংস্থানকে কারণ বলে প্রকাশিত করা হয়। কারণ এবং প্রেষণা পরস্পর সাপেক্ষ যেমন, বস্তুর চেতনার সাথে সাথেই আত্মচেতনাও তৈরি হয়। এ আত্মচেতনা বস্তু থেকে মানুষকে পৃথক করে।

---

84 Robin Morris and Geoff Ward, *The Cognitive Psychology of Planning* , New York, Psychology Press Taylor & Francis Group, 2005, p. 154.

সার্ত্রের চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চেতনার দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো স্বাধীন চেতনা এবং অপরটি হলো পরাধীন চেতনা। স্বাধীন চেতনা শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ চেতনা স্বাধীন বিধায় বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। এজন্য বলা হয় অস্তিত্ববাদের সুর বর্তমান পর্যায় থেকে অনাগত ভবিষ্যতের পর্যায়ে উত্তরণ, যা সার্ত্রীয় চিন্তায় একটি বিশেষত্ব রয়েছে। সিমন দ্য বোভোয়ার চিন্তাধারায়ও অস্তিত্ববাদের একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়, তা হলো উত্তরণ যাকে বলা হয় হওয়া থেকে করা। এ বক্তব্যের মূল কথা হলো, "প্রত্যেক মানুষের সারসত্তা নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে এবং দায়বদ্ধ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে। এ এক প্রবল পুরুষকারদৃষ্টি, কর্ম ও সংগ্রামের আহ্বান।"[৮৫]

সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হলে চেতনার মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতিগুলো বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রতিবন্ধকতা মনে করে সময়বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। অর্থাৎ নিজের মধ্যে যত ক্ষোভ, হতাশা ও দুঃখ এবং অতীতের কোনো ভুল অনুভব করবে তত ব্যক্তির নিজ কাজ করা থেকে দূরে সরে যাবে। এ ধরনের অনুভূতি চেতনাতে নিয়ে এসে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্মাণের স্বার্থে আঁ-সোঁয়া বা বস্তু মনে করে দূরীভূত করতে হবে। তবে চেতনা শুধু বস্তুর চেতনা নয়, আত্মচেতনাও বটে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি কাজ খামখেয়ালিভাবে হয়। আবার প্রত্যেকটি কাজ স্বাধীন এ অর্থে যে তাকে চেতনার প্রকল্পের সাথে যুক্ত করে বুঝতে হবে। আবার এর অর্থ এই নয় যে, আমার কর্ম যা খুশি তাই হতে পারে কিংবা আগে থেকে বুঝা যায় না।

একটি নির্বাচনকে তখনি স্বাধীন বলা হয়, যখন কাজ থেকে চেতনাকে পৃথক করে কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করা যায়। অনেক পথযাত্রার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবং যাত্রা থেকে বিরত হলাম। কেউ বলতে পারে, আমি তো স্বাধীন ছিলাম এবং ক্লান্তিকে রুখতে আমি সক্ষম ছিলাম। সমস্যা এরকমভাবে বলা যায় যে, আমি কি আমার প্রকল্পের সামগ্রিক গঠনে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে অন্য কিছু করতে পারতাম? ক্লান্তি আমার সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। ক্লান্তি হচ্ছে আমার দেহে আমি যেভাবে আছি, তার একটি ভঙ্গি এবং এটিই আমার চেতনার বাস্তবতার দিক। আমি যখন পথযাত্রায় বেরিয়েছি, আমার কাছে যে জগৎ প্রকাশিত, তাই আমার চেতনার বিষয়। আমি যতখানি গ্রামাঞ্চলে চারপাশ আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে এবং হেঁটে উপভোগ করছি, ততখানি আমার দেহের সম্পর্কে একটি সংযুক্ত চেতনা আছে। যা জগতের সাথে আমার সম্পর্ক পরিচালিত করছে এবং যা জগতের সাথে আমার যোগকে গড়ে তুলেছে ক্লান্তিময় অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। ক্লান্তির সংবৃত্তির মধ্য দিয়ে তা আমার কাছে সহনীয় বা অসহনীয় মনে হতে পারে। চেতনা যখন ক্লান্তিময় দেহকে আলাদা করে উপলব্ধি করে, তখনি ক্লান্তি অসহনীয় মনে হয়। ক্লান্তির অবস্থায় আমি কী সিদ্ধান্ত নেব

---

85 রবিন ঘোষ সম্পাদিত, ewIK msL¨v 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

তা নির্ভর করে বৃহত্তর প্রকল্প নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। আমার সঙ্গীরা ক্লান্ত, কিন্তু যদি তারা এগিয়ে যেতে স্থির করে, তাহলে বুঝতে হবে, ক্লান্তিতে তারা প্রকৃতি জয়ের এবং প্রকৃতি উপভোগের বৃহত্তর প্রকল্পের পটভূমিকায় ভোগ করেছে। এ প্রকল্পের দ্বারাই ক্লান্তিকে বুঝা যাবে এবং তাদের কাছে ক্লান্তির অর্থ স্পষ্ট হবে।

ফ্রয়েডের অনুরূপ সার্ত্রে বলেন, একটি কাজ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরও অনেক গভীর অবয়বের প্রতি তা নির্দেশ করে। ফ্রয়েডের কাছে, কাজ হলো প্রতীকী। তা আরও গভীর অভিলাষকে প্রকাশ করে, যা ব্যক্তির অতি অভিলাষের দ্বারা নির্ধারিত বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পার। কিন্তু ফ্রয়েড কাজটি পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা না করে আরও গভীরতর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। ফ্রয়েডের মনোবিদ্যায় শেষতম কারণ আদিকামনা বলে মনে হয়। ফ্রয়েড রৈখিক নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন, যে নিয়ন্ত্রণবাদে পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়ে পরবর্তী ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন হয়ে থাকে প্রাকৃতিক ঘটনার বেলায়। কিন্তু সার্ত্রে মনে করেন, আদিকামনা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় রৈখিক নিয়ন্ত্রণবাদে প্রথিত হয়ে গেছে। ফ্রয়েড সমস্ত কাজকে অতীতে জটিল মানসিক অবস্থা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর মনঃসমীক্ষণে ভবিষ্যতের কোনো স্থান নেই। সার্ত্রে প্রত্যেক কাজটি বুঝতে চান বড় উপপত্তি সাথে যুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ কী হতে চায় তার ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক আচরণবিধি, যেমন হীনম্মন্যতা একটি স্বাধীন এবং ব্যক্তি বিশেষের জাগতিক উপপত্তি, যে উপপত্তি দ্বারা ব্যক্তি অন্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের মতো নিজের জীবন গড়ে তুলতে চায়। প্রত্যেক উপপত্তিই একটি সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে গঠিত। যে প্রশ্ন হয়েছিল তাতে আবার ফিরে আসা যাক। আমি কি ক্লান্তির কাছে পরাজয় স্বীকার না করে অন্য কিছু করতে পারতাম? সার্ত্রে বলতে চান, কাজটা অহেতুক নয়, কারণ একে বুঝতে হবে একটি প্রাথমিক উপপত্তির সাথে যুক্ত করে, যার অবিচ্ছেদ্য অংশ এ কাজ। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, কাজটির পরিবর্তন করতে গেলে আমার আদি উপপত্তিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষের সম্ভাবনার মাত্রা নির্দেশ করে কাজের প্রাথমিক অবস্থা ও শেষ অবস্থা বিচার করে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে বলেন, "Thus this possible to stop theoretically takes on its meaning only in and through the hiearchy of the possible which I am in terms of the ultimate and initial possible. "[৮৬] অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, আমার থামা দরকার, কিন্তু থামতে হলে আমার উপপত্তিতে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। যে নির্বাচনগুলো আমরা করি সেগুলো আমাদের অযৌক্তিক উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়েই তা অনুভব করি। নির্বাচন কোনো পূর্বস্থিত সত্তা থেকে আসে না; বরং অবাস্তব অবস্থা নির্বাচনের দ্বারা অর্থ যুক্ত হয়ে ওঠে।

অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতা অবিরত আমাদের প্রকল্পকে দুর্বল করে তুলেছে; কারণ আমরা জানি, আমরা যা হব তা ভবিষ্যতের দ্বারাই হব, অথচ এ ভবিষ্যতের ওপর আমাদের কোনো হাত নেই, কারণ তা সবসময়ই সম্ভাবনার

---

86 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

স্তরে থাকে। তাই সবসময় আমাদের নির্বাচন শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে, এ ভয় থাকে এবং আমাদের বার বার যা নই তা হওয়ার জন্য নির্বাচন করতে হবে, এ আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যাকে আদি নির্বাচন বলা হয়, তা সব কারণ ও প্রেষণাগুলোকে সৃষ্টি করে; যেগুলো আমাদের কাজের প্রদর্শক হয়। আমরা নির্বাচন করি এ কথার অর্থ হচ্ছে এমন একটি ভবিষ্যৎকে আনয়ন করা যা আমাদের জানাবে আমরা কী এবং অতীতের ওপর কী অর্থদান করবে। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "এ জন্যই স্বাধীনতা, নির্বাচন, শূন্যতা, সাময়িকতা সবই এক এবং একই বস্তু।"[৮৭] এখানে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেছেন, দুই রকমের সম্ভাবনা আছে, মুখ্য এবং গৌণ সম্ভাবনা; এবং দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমটির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনা বর্তমান সম্ভাবনাকে বদলে দিতে পারে এবং তাতে সমগ্র অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। সত্তাগত সমাধানের দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলোও সমগ্রকে পাওয়ার প্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। এর অর্থ হলো যে সামগ্রিক প্রকল্পকে আমি আমার পরম প্রকল্প হিসেবেই ধরেছি, তা বিশেষ কোনো সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে না। আমার প্রত্যেকটি কাজ জগৎ এবং আমার বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু কোনটির দ্বারাই একথা বুঝা যায় না, আমি এ মেলামাইনের গ্লাসটি হাতে নিয়েছি কেন এবং কাচের গ্লাসটি হাতে নেইনি কেন। এ ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে স্বাধীন সত্তা উদাসীন এবং এসমস্ত স্বাধীন নির্বাচনগুলো আমার পরম উপপত্তির ঐক্যে সংঘবদ্ধ।

জাঁ-পল্ সার্ত্রে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, চেতনা ও স্বহেতু সত্তা স্বাধীন এবং জগতের সংস্থান সম্ভব করে। কারণ চেতনা এমন কিছু যাকে ভবিষ্যতের আলোকে অতীতকে নতুন করে গড়ে তুলে। চেতনা নির্বাচন করা ছাড়া থাকতে পারে না এবং চেতনার কাজ হচ্ছে সর্বদাই কোনো না কোনো কিছু নির্বাচন করা, কিন্তু সেটি অর্থহীন ও অর্থপূর্ণ হতে পারে। তবে অর্থপূর্ণ বা যথার্থ নির্বাচন করা ছাড়া ব্যক্তির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই "সার্ত্রের বিষয়ীকতা যদিও অতিক্রমণের আভাস আছে তথাপি তা ব্যক্তি চেতনায় আবদ্ধ।"[৮৮]

পরিবেশ ব্যক্তির উপলব্ধিজনিত পরিস্থিতি রচিত হয়ে ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিস্থিতি সবসময় চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে এবং চেতনাকেও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে, কারণ চেতনা জগৎ স্থিত সত্তা। অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি এবং যেসব কাজের প্রতীকী অর্থ সেগুলোকে যান্ত্রিকভাবে বুঝলে চলবে না; বরং ব্যক্তির নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতীকগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সার্ত্রে মনে করেন, অভিজ্ঞতাবাদী মনঃসমীক্ষণে সমীক্ষক যেমন কেন্দ্রগত প্রবৃত্তিকে ধরতে পারেন তখন রোগীর দিক থেকে বাধার

---

87 প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

88 মো: এলামউদ্দিন,bRiæj mwn‡Z¨i 'vkwbK A½xKvi, The Jahangirnagar Review Part C, vol. xv & xvi, 2003-2004 & 2004-2005, p. 144.

প্রাচীর ভেঙে পড়ে। কিন্তু যা অবচেতনে ছিল, তাকে চিনতে হয় অন্যের মাধ্যমে। সুতরাং রোগীর কখনো অবচেতনের সাথে চেতনের সমন্বয় হয় না। আসলে কিন্তু রোগীর যে উপলব্ধি হয়, তা নিজেই একটি সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, এটি সম্ভব যদি রোগী সবসময়েই কিছু না কিছু ভাবে সচেতন থাকে।

অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষণে যে প্রবৃত্তিগুলোকে মানসিক রোগের কারণ বলে তুলে ধরে, তা শুধু সম্ভব চেতনার মাধ্যমে। চেতনা যেন একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুর পার্থক্য করে এবং যা নিজের থেকে আলাদা করে জানা সম্ভব হয়। অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষণ ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে চেতনাকে প্রধান স্থান দেয়। এ চেতনা বা সংবিতের উদ্দেশ্য ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্পষ্ট করে দেখানো। এজন্য চেতনা হলো এক ধরনের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে জানতে পারে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণকে মূল্যায়ন করতে পারে। তাদের পরম ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইত্যাদি জানার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার চেতনার প্রকৃতি প্রমাণিত হয়।

অস্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার লক্ষ্য এক ধরনের সম্ভাবনা ও শূন্যতা, যার কাজ হলো সর্বদাই নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া। নিজেকে অতিক্রম করার যে ক্ষমতা ও প্রবণতা সার্ত্রের দৃষ্টিতে এটিই স্বাধীনতা। চেতনা সার্ত্রের কাছে পুর-সোঁয়া। এ চেতনা বিষয়শূন্য হলেও যেকোনো বিষয় জানতে পরীক্ষণের যন্ত্রের মতো কাজ করে। তাহলে বলা যায়, চেতনাই জড় জগৎকে জানবার ও সবকিছু অনুধাবন বা বুঝার জানালা। চেতনা ছাড়া কোনো জড়বস্তু (আঁ-সোঁয়া) নিজেকে জানতে ও প্রকাশ করতে পারে না। একমাত্র চেতনাই জড়বস্তু জানতে এবং সেই জড়বস্তু গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এ চেতনার জন্য মানুষ নিজের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্বাচন করতে পারে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণসহ অনেক গোপন বিষয় যেমন, নিজের ও অন্যের ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে পারে। এজন্য চেতনাসম্পন্ন মানুষ স্বাধীন।

2.2 gvbeRxe‡b ¯vaxbZv

প্রাণী হিসেবে মানুষ শারীরিক কোনো কারণে অন্য প্রাণীর তুলনায় বড় নয়। কারণ অন্যখানে, মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়েছে অন্যভাবে। তার মধ্যে মানবিক দিক রয়েছে যা প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাছাড়া একমাত্র প্রাণী হিসেবে ব্যক্তিমানুষ, যার স্বাধীনতা আছে বা সে স্বাধীন। সার্ত্রে সাধারণ সত্তা অগ্রাহ্য করলেও তাঁর দর্শনে যে চারটি সত্তাকে তিনি অকপটে স্বীকার করেন। তার মধ্যে প্রথম সত্তা হলো মানুষ স্বাধীন এবং তা প্রকাশ পায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ভালোর মধ্যে সর্বোচ্চ ভালোকে নির্বাচন করার মাধ্যমে। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন সার্ত্রের দুটি নাটক 'বন্ধ দরজা'য় (১৯৪৫ খ্রি.) অথবা 'আলতোনা দিয়ে বন্ধ' (১৯৬০ খ্রি.) বিশ্লেষণ করে তিনি স্বাধীনতার উন্মেষ সম্পর্কে বলেন, "মানুষ তার দুরবস্থা ও বন্দি জীবন থেকে স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। ... তিনি আরও বলেন, মানুষ একা একা ব্যক্তিমানুষের জীবন গড়তে আরম্ভ করল। মানুষ খুঁজতে শুরু করল তার নিজের 'একক' জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-অভিলাষের পূর্তি, পূর্ণতা ও ফুর্তি এবং সবশেষে স্বাধীনতা।"[৮৯] আর এ স্বাধীনতার স্পর্শে ও আলোতে এ দুর্বল প্রাণীটিও হয়ে যায় অসাধারণ। অন্যান্য প্রাণিকুলের সব নেপথ্যতা সে নিমিষেই অর্জন করতে পারে। যে দিকটা তাকে প্রচণ্ড শক্তি জোগায়, সীমাহীন উদার করে, দয়ালু করে এবং করে ক্ষমাশীল। আবার স্বাধীনতা নিজেই একক, নির্জন ও নিঃসঙ্গ হওয়ার কারণে দায়িত্ব ও কর্তব্যে সে হয়ে ওঠে নির্মম ও নিষ্ঠুর। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিমানুষের কাছে অভিজ্ঞতা ও নিজের স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব রক্ষাই হচ্ছে অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণেই সামান্য মানুষটি অসামান্য হয়ে ওঠে জীবিতাবস্থায় সবার প্রদয়ের মধ্যমনি হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরও যুগ যুগ বেঁচে থাকে। স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক সত্তা হিসেবে বিবেচ্য। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করলেও তার গভীরতা ও মাত্রা কতটুকু তা নির্ণয় করা সহজ নয়। ব্যক্তি নিজের পক্ষে এ ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি সঠিক নির্বাচন করতে পারে এবং সেই নির্বাচিত লক্ষ্যের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থেকে সফল হয়। এ সফলতা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার গভীরতার মাত্রা নির্ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে John Wild বলেন,

> The existential thinker is now aware of a deeper dimension of human freedom. Quite strange to the western tradition of philosophy up to the time of kant. This must lead him to be highly critical of traditional theories. The rationalistic views of freedom of the will' as action in accordance with a pre-established order, is far too narrow and leads to determinism in the end. The same is true of naturalistic attempts to identify freedom with special forms of

89 এ. কে. এম সালাহউদ্দিন, i|cZË, ঢাকা, রাদ্ধ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২২।

> determinism (action from internal causes, for rational ends, etc). All such theories attempt to fit freedom into an alien objective frame, and therefore destroy it.[90]

এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তির সংগ্রামী অনুভূতির সাথে জড়িত বলে স্বাধীনতা অবস্তু, আর এটি অবস্তু বলেই বস্তু বা ঈশ্বরের মতো পরিপূর্ণ হতে চায়। এ প্রসঙ্গে জরাথুস্ত্রবাদের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, "জরাথুস্ত্রবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। সে ইচ্ছানুযায়ী পাপ বা পুণ্য করতে পারে।"[৯১]

জাঁ-পল্ সার্ত্রের সাথে জরাথুস্ত্রবাদের বৈসাদৃশ্য হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার সার্থক প্রয়োগ দেখাবে শুধু পুণ্য বা ইতিবাচক কাজে বা আচরণে; ব্যক্তিমানুষ সবসময় ভালো জিনিসকে নির্বাচন করবে, অঙ্গীকারবদ্ধ ও দায়িত্বশীল হবে। অস্তিত্ববাদের জনক কিয়ের্কেগার্ড দাবি করেন, মানবসত্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অভিন্ন; আর এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা সফল হয় ধর্মীয় স্তরে পদার্পণের মাধ্যমে। তিনি বলেন, "The monastic movement is an attempt to be superhuman, an enthusiastic, perhaps even a devout attempt to resemble God. But herein lies the profound suffering of true religiously, the deepest thinkable, namely, to stand related to God in an absolutely decisive external expression for this. "[92]

অনুরূপভাবে, দার্শনিক হাইডেগার জগৎস্থিত মানবসত্তাকে স্বাধীন বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন,

> The ability, to speak and the ability to hear are equally fundamental. We are a conversation-and that means; we can hear from one another. We are a conversation. That always means at the same time: we are a single conversation. But the unity of a conversation consists in the that in the essential word there is always manifest that one and the same thing on which we agree and on the basis of which we are united and so are essentially ourselves. Conversation and its unity support our existence .[93]

কোনো অবভাসিক বিষয়ে একজন মানুষ নিজের সাথে নিজে এবং অপর ব্যক্তির সাথে কথোপকথন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর সারার্থ ও প্রায়োগিক দিক খুঁজে বের করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। এসব কিছু করার

---

90 John Wild, *Existence and the World of Freedom*, USA, Northwestern University, 1963, p. 15-16.

91 মো. মাসুদ আলম, Ri_¯ I Zvi agZË: একটি সমীক্ষা, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৪: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ২৩৯।

92 Soren Kierkegaard, *Concluding Unscientific Postscript*, op. cit., p. 440.

93 M. Heidegger, *Existence and Being*, op. cit., p. 278.

মুহূর্তে নিজেকে স্বাধীন হিসেবে উপলব্ধি করে, সে মুহূর্তে তার অনুভূতি এক বস্তুকে অন্যসব বস্তু থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করে এবং অনুভব করে যে তার সত্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে ড. গালিব আহসান খানের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, "আচরণের স্বাধীনতা যে নিয়ন্ত্রিত হয়, এটিই প্রমাণ যে স্বাধীনতা আছে; স্বাধীনতা না থাকলে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হতে পারত না।"[৯৪] প্রতিটি মানুষের এ স্বাধীনতাবোধ জাগতিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়েও সিদ্ধ হয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিনিয়ত নিজের বর্তমান অবস্থান নিয়ে ভাবে ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করে। নিজের লক্ষ্য স্থির করে এগুলোর মধ্য দিয়েই মানবজীবনে স্বাধীনতা প্রতিফলিত হয়। সার্ত্রে তাঁর দর্শনে স্বাধীনতার ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা জগতে মানুষই একমাত্র কোনো যথার্থ চেতনাসম্পন্ন জীব এবং এরূপ আত্মচেতনাই তার স্বাধীনতার উৎস। একমাত্র চেতনাই স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বনির্ধারিত। সেজন্য চেতনাসম্পন্ন মানুষই জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে তার স্বভাব, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, নানাবিধ সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে মনে করতেন, "প্রত্যেক চেতনা নিজের মধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ নিজের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরতা মুক্ত।"[৯৫] প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে গড়ে তোলে এবং নিজেকে আপন ইচ্ছা অনুসারে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব রকম দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে কৃতকার্য হয় তাহলে এর সুফল সে ভোগ করবে; আর যদি স্বাধীনতার অপব্যবহারে মাধ্যমে অকৃতকার্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সবকিছু তাকেই বহন করতে হবে। Joseph Keim Campbell বলেন, "… Free will is a power. There is a some debate about whether it is a single, fundamental powers but there is universal agreement it is a power associated with choice and action."[96]

এখান থেকে বলা যায়, একজন আত্মসচেতন বা স্বাধীন মানুষ বিভিন্ন বিকল্প দিক বিবেচনা করে নিজস্ব রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্বাচন করতে পারে। আর এরূপ স্বাধীন নির্বাচন করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সে তার মানবিক সত্তার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। তাই আত্মসচেতনতা হলো স্বাধীন মানুষের সক্রিয় সত্তা। মানবজীবনের চেতনা সর্বদাই তার বস্তুকে জানে এবং এ জানার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠে। চেতনা তার এরূপ ক্রিয়ার দ্বারা উপস্থিত বাস্তবতাকে বর্জন করে এবং অনাগত ভবিষ্যৎকে আহবান করে। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "...The situations, the common products of the contingency

---

94 ড. গালিব আহসান খান, f‡Mvj, ms¯'wZ I wbqšYev', †'e ¯§viK e³Zv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৩৫।

95 জাঁ-পল্ সার্ত্রে ও তার সংলাপ, Abev'msMn 1, অরুন মিত্র সম্পাদনা, চিন্ময় গুহ, কলকাতা, গাঙচিল প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১৭৯।

96 Joseph Keim Campbell, *Free Will*, Cambridge, polity press 65 Bridge Street, 2011, p. 41.

of the in-itself and of freedom, is an ambiguous phenomenon in which it is impossible for the for-itself to distinguish the contribution of freedom from that of the brute existent. "[97]

মানবজীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা কীভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়, তার গুরুত্ব তুলে ধরেন জাঁ-পল্ সার্ত্রের 'flies' নাটকে এভাবে,

> আরগসের নিহত রাজা আগামেমননের ছেলে অরেস্টিস তার ক্রীতদাস গৃহশিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর কোরিন্টে অবস্থানের পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আরগসে বাস করে। এজিস্টার তার ভ্রাতা আগামেমননকে হত্যা করার পর অরেস্টিসের মা অর্থাৎ আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে বিয়ে করেন এবং অপরাধক্লিষ্ট মনে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। দীর্ঘ দিন পর অরেস্টিসের সাথে তার বোন ইলেকট্রার সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়েই তাদের মা ও বিপিতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে। জিউস (ঈশ্বর) অরস্টিসের এ কুমতলব জানতে পেরে তাকে আরগস ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন। অরেস্টিস তখন উচ্চস্বরে বলে ওঠে: আজ থেকে আমি আর কারো কথা শুনবো না, মানুষেরও না, ঈশ্বরেরও না। জিউস তখন এজিস্টাসকে অরেস্টিসের অভিসন্ধির কথা জানান এবং নির্মম হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য অরেস্টিসকে বন্দি করে কারাগারে আটক করে রাখতে পরামর্শ দেন। এজিস্টাস যখন জানতে চাইলেন ঈশ্বর হয়ে তিনি কেন এ ট্র্যাজেডি বন্ধ করতে পারেন না, তখন জিউসের মুখ থেকে একটি গোপন কথা বেরিয়ে আসে, দুঃখের ব্যাপার হলো মানুষ স্বাধীন, অরেস্টিস জানে যে, সে স্বাধীন। মানুষের অন্তরে স্বাধীনতার চেতনা যখন একবার জাগে, তখন ঈশ্বর তার কাছে দুর্বল।[৯৮]

এখান থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তিমানুষ যখন একবার স্বাধীন চেতনা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন ঈশ্বর কিংবা যেকোনো মানুষকে অস্বীকার করে একাই চলতে পারে। আর স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সত্তাবোধকে ব্যক্তিমানুষ যদি নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে ঐ ব্যক্তি মানুষকে পশু-কীটের সাথে তুলনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রের 'মাছি' নাটকে অরেস্টিসের কণ্ঠ থেকে যেসব উক্তিগুলো উচ্চারিত হয়েছে যেমন, অরেস্টিস বলছে জিউসকে "ও আমার জীবনের চেয়ে। কিন্তু ওর দুঃখ ওর নিজের। একমাত্র ওই তা থেকে মুক্ত করতে পারে। কারণ সে স্বাধীন।"[৯৯] এজন্য বলা হয় প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ তার নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং নিজের নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারেও স্বাধীন। নির্লিপ্ত ও বিরূপ বিশ্বে মানুষ এক অনন্য নিঃসঙ্গ প্রাণী। সম্প্রতি পিলখানার হত্যাকাণ্ড যারা পরিকল্পনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের অন্তরে জিউসের (ঈশ্বর) দ্বারা বা সাধারণ

---

97 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness,* op. cit., p. 488.

98 ড. নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

99 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, gwQ bvUK, ভাষান্তর, গৌতম ভট্টাচার্য, কলকাতা, প্যাপিরাস প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৫৪।

অর্থে বিবেক বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং জিউস তাদের এ দুরভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র অন্য মানুষকে জানাতে কিংবা এ ট্র্যাজেডি বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, মানুষকে স্বাধীনতা নামক একটি সত্তা দিয়েছেন, জিউসকে অগ্রাহ্য করে যেকোনো ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এজন্য মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী। শুধু তাই নয়, অরস্টিস জিউসকে (ঈশ্বর) বলেছেন তুমি নিঃসঙ্গ, আমিও নিঃসঙ্গ বিধায় আমরা উভয়েই স্বাধীন, এজন্য সব প্রতিকূল কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন সত্তাকে ব্যবহার করে থাকে। স্বাধীন সত্তার সৃষ্টি হয় সংকটের প্রতিকার ও দুরবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে, যে কাজের বা আচরণের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই; সে ধরনের কাজ বা আচরণ করে যাওয়া, এ কাজ করতে যেয়ে বিপরীত অনুভূতির সাথে যে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয় তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হলো স্বাধীন সত্তা। এ স্বাধীন সত্তা সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নৈতিক কাজ করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। অর্থাৎ এখানে স্বাধীনতার অর্থ স্বাধীন হওয়া মানেই নৈতিক কর্মে লিপ্ত হওয়া।

মানবজীবনে স্বাধীন চেতনা ক্রমাগত নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলে চলেছে। "যে স্বরূপে আমি আজ আছি কাল তা নাই হয়ে যেতে পারে। তাই স্বরূপধর্মই স্বাধীন অস্তিত্বের গায়ে লাগে না। প্রকৃতপক্ষে আমি নিঃস্বরূপ কিছু না- কেবল শূন্যতা দিয়ে ঘেরা। আমার স্বরূপগুলো আমার মুখোস। ঐ মুখোস ছিন্ন করলে সার্ত্রের মতে, আমার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য একান্তই শূন্যতায় ডুবে যায়।"[১০০] এখান থেকে বুঝা যায় যে, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষ স্থির নেই, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। মানুষ সর্বদা কিছু না কিছু হতে চায়, বস্তুত সব মানুষের মধ্যেই কিছু একটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাই তাকে এক অবস্থা পরিত্যাগ করে অন্য অবস্থানের দিকে গতিশীল হওয়ার জন্য নিয়ত তাড়িত করে চলেছে। চেতনার স্বভাবই এমন যে, সে কোনো একটি কিছু ধ্বংস করে অন্য কোনো একটি সৃষ্টি করছে। এরূপে দেখা যায়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সে পায় তাকে সে পছন্দ করে না। মানুষ যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় সে বেশি দিন অবস্থান করতে আগ্রহী হয় না; বরং তাকে অতিক্রম করে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানবজীবনে স্বাধীনতা দ্বারা ব্যক্তি নিরন্তর কাজ করে এবং না হওয়াকে হওয়াতে রূপান্তর করে। এ রূপান্তর হওয়ার প্রয়াসই হলো মানবজীবনে স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে যজ্ঞেশ্বর রায় তার 'জাঁ-পল্ সার্ত্রে ও মার্কসবাদ' গ্রন্থে বলেন, "প্রত্যেক মানুষেরই স্ব স্ব কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তিই নিজের কর্মের কর্তা। কর্ম যখন এভাবে ব্যক্তির কর্তব্য হয়ে ওঠে তখন স্বভাবতই সে কর্মের দায়িত্ব স্বীকার করে, কামু একে বলেছেন নৈতিকতা; কিন্তু সার্ত্রে একেই বলেন স্বাধীনতা।"[১০১] আর এজন্য হয়ে উঠার

---

100 রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, cvðvZ¨ 'k‡bi i‡c‡iLv, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯২, পৃ. ৪৫৮।

101 যজ্ঞেশ্বর রায়, Rv-cj mv‡Î I gvKmev', কলকাতা, প্যাপিরাস প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২৭।

পথ হলো কর্মের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। ব্যক্তি যখন স্বাধীন সত্তা দ্বারা লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তখনই ব্যক্তির হয়ে উঠার অস্তিত্ব তৈরি হয়। যেমন, কেউ যদি শিল্পী হতে চায় তাহলে তাকে লক্ষ্যাভিমুখী ক্রিয়া (Praxis) অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং এ শিল্পী হওয়ার পর আবার নতুন ধরনের 'না হওয়া' বোধ চলে আসবে। কেননা মানবজীবনের স্বরূপ এমন যে, সে কোনো নতুন কিছু হওয়াতেই স্থির থাকতে পারে না। সে সব সময় সে যা নয় তার দিকে পরিচালিত বা ধাবিত হয়।

এখান থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের পূর্ব স্থিরকৃত নিয়ন্ত্রণ কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নেই। কারণ তা থাকলে ব্যক্তি চেতনায় না হওয়ার বোধ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণাটাই আসবে না। এজন্য প্রত্যেক মানুষের একটি মূল লক্ষ্য থাকা উচিত, যা পূরণ করার জন্য ব্যক্তি নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং বাস্তবায়ন করে সে অস্তিত্বশীল মানুষ হবে। স্বাধীনতার সাহায্যে মানুষ অবাস্তব জগতের সাথে প্রতিযোজন করতে চায় এবং তার জন্যই সে পরম লক্ষ্যকে বেছে নেয়। এ উদ্দেশ্য এমন যা তাকে অবাস্তব জগতের সাথে একাত্মতা দিতে পারে, যে উদ্দেশ্য সফল হলে সে বস্তুর মতো শান্তি, অচঞ্চলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করবে। মানুষ তার জীবনে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে, তার সবগুলোর পরম লক্ষ্যই এক, যাতে চেতনা ও বস্তু অভিন্নতায় আসতে পারে। মানুষ এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হীনম্মন্যতা বা উচ্চম্মন্যতা, যেকোনো কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। তবে অন্য আরো কোনো উদ্দেশ্য মানুষের থাকতে পারে, যা দিয়ে সে পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সার্ত্রে বলতে চান পরম লক্ষ্যকে করায়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কেননা মানুষের চরম কামনা ঈশ্বরের মতো পরিপূর্ণ হওয়া। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর হচ্ছে চেতন ও অচেতনের মিলনস্থল। কিন্তু চেতনা ও অচেতনের মিলন সম্ভব হতে পারে না। সার্ত্রের মতে, চেতন ও অচেতন পরস্পরবিরোধী, তাই ঈশ্বরের ধারণা স্ববিরোধী। এজন্য ঈশ্বর জাগতিকভাবে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষার বা পূর্ণতার মধ্যে অস্তিত্বশীল। মানুষের সাধনা ঈশ্বর হওয়া, কিন্তু এ প্রচেষ্টা নিষ্ফল। বিমূর্ত জগতের সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে সার্ত্রে হাইডেগারের মতোই বাস্তবতা (Facticity) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই 'Facticity' হচ্ছে "The question of its facticity is whether a commitment is apt for truth, because purporting to state a fact, as opposed to having some other function." [১০২] কিন্তু এ বাস্তবতা মানব সম্পর্ক রহিত জড় প্রকৃতি নয়। মানুষ এ জড় প্রকৃতি ব্যবহারের ফলে একটি অর্থ পরিগ্রহ করেছে, যাতে জাগতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ নিজেকে ও অপরের শারীরিক ও মানসিক চেহারা দেখে; কিন্তু যে পরিবেশ অর্ধেক জড় জগৎ ও অর্ধেক মন সক্রিয়তায় গঠিত সে বিষয়ে গবেষক জাঁ-পল্ সার্ত্রের মতের সাথে কিছুটা ভিন্ন মত প্রদর্শন করেন এবং মনে করেন যে, অর্ধেক জড় জগৎকে আঁ-সোঁয়া ও অর্ধেক মন সক্রিয়তা পুর-সোঁয়া বলে দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু

---

102 Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary Of Philosophy,* New York, Oxford University Press, 1996, p. 134.

আসলে অর্ধেক মন সক্রিয়তা পরা জগৎ আর অপরটি অর্ধেক জড় জগৎ হবে জরা জগৎ। এখানে পরা জগৎ বলতে বুঝানো হয়েছে চেতনার জগৎ; আর জরা জগৎ বলতে তার বিপরীতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা জরা জগতের বাসিন্দা তারা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে না। তারা জীবের মতো সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে Martin Buber বলেন,

> The unaffectedness of wishing is stifled by mistrust everything around is hostile or can become hostile agreement between one's own and the other's desire ceases, for there is no true coalescence or econciliation with what is necessary to a sustaining community, and the dulled wishes creep hopelessly into the recesses of the soul. But now the ways of the spirit are also changed. Hitheto it was the characteristic of its origin to flash forth from the clouds as the concentrated manifestation of the wholeness of man. Now there is no longer a human wholeness with the force and the courage to manifest itself. For spirit to arise the energy of the repressed instincts must mostly first be 'sublimated', the traces of its origin cling to the spirit and it can mostly assert itself against the instincts only by convulsive alienation. The divorce between spirit and instincts is here, as often, the consequence of the divorce between man and man. [103]

মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য মনস্তাত্ত্বিক হলেও তা বুঝার জন্য যে বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে হয় তা হলো সে ব্যক্তি কী ধরনের কাজ করে? কীভাবে আচরণ করে, তা কতটা স্বাধীনতা চেতনা দ্বারা সমর্থিত তা নির্ণয় করার জন্য যে ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করে সে সার্ত্রে দৃষ্টিতে স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। এ কারণে যারা পরা জগতের বাসিন্দা তারা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য চিহ্নিত করেও উপলব্ধি করে, যে সত্তা দ্বারা এ ধরনের কার্য সম্পাদন হয় তাকে বলা সূক্ষ্ম চেতনা। যে ব্যক্তি সূক্ষ্মতম চেতনাকে ধারণ করে সে-ই অস্তিত্বশীল ব্যক্তি।

স্বাধীনতাকে সার্ত্রে একটি গভীর অর্থে সীমিত করেছেন। অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমানুষ স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কাজের মাধ্যমে নিত্যনতুন জ্ঞান অর্জনের কোনো বিশেষ কিছু হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতাকে সীমিত করেছেন। তাই সার্ত্রে বলেন, "মানুষের জীবনের প্রকৃতিই হলো নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়া এবং

---

103 Martin Buber. *Between Man and Man,* trans. by Ronald Gregor Smith, Boston, Beacon Paperbacks, 1955, p. 196.

তার রূপায়ণের প্রয়াস চালানো এটিই তার স্বাধীনতার প্রকাশ।"[১০৪] 'আমার স্থান' সম্বন্ধে সার্ত্রে বলেন, একথা ঠিক আমি কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে আছি এবং সে স্থান অন্য স্থানের উপর নির্ভরশীল, যা শেষ পর্যন্ত আমাকে জন্মের স্থানে নিয়ে যায়, যা আমার নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি। এজন্য নিয়ন্ত্রণকারীরা বলেন, স্থানের বাস্তবতা আমার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। মানুষ কোনো স্থানে আছে ঠিকই; কিন্তু সে সব সময়ই অন্য কোনো স্থানে যেতে পারে। আমি যখন অনেকগুলো বস্তুকে এটি টেবিল, এটি ঘর, এটি চেয়ার, এটি বাড়ি এভাবে বুঝতে থাকি, তখন 'এ' শব্দ দ্বারা একটি স্থানকে বুঝি এবং তার দ্বারা আমার নিজের থেকে আলাদা করে বস্তুগুলোকে একটি সংস্থান দেওয়ার চেষ্টা করি। 'আমার অতীত' সম্বন্ধে সার্ত্রে বলেন, স্বাধীনতা অর্থ অতীতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া; কিন্তু এর অর্থ এ নয় অতীতকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সম্ভব। আমি যদি বিশেষ কোনোভাবে অতীতে প্রতিপালিত হয়ে থাকি, তবে তার অর্থ বিশেষ কোনো পেশাকে আমি গ্রহণ করব।

মানুষ যেসব অচেতন বা জড় পদার্থ ব্যবহার করে, সেগুলো সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। একটি পূর্ব প্রদত্ত বস্তু বা উপাত্ত থাকবে, যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু যে পরিবেশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তাকে আমার জগতে পরিবর্তিত করা সম্ভব আমার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা। আর এ স্বাধীন ইচ্ছা মানুষ অচেতন পদার্থ থেকে নিজেকে পৃথক করে। তবে একথা সত্য যে অস্তিত্বের পূর্ণতার জন্য অপর ব্যক্তিকে যেমন আমার প্রয়োজন ঠিক তেমনি আবার অপর ব্যক্তি আমার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে অস্তিত্ব পূর্ণতা অর্জনে বাধাগ্রস্ত করে। এজন্য অস্তিত্ববাদীরা বলেন, মানুষই মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে। কেননা অপর মানুষের সামনে আমার নিজেকে বস্তু বলে মনে হয়, তবে এ বস্তু মনে হওয়াটা সব সময়ে চেতন মনে নাও হতে পারে। আবার একথাও ঠিক, অপর ব্যক্তির সাথে সংগ্রামে জড়িয়ে আমি আমার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করি। আমার সম্বন্ধে অপরের যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তা আমার স্বাধীনতার উপর বাইরের নিয়ন্ত্রণ এবং যেহেতু সে ধারণা আমার কাছে দুর্লভ, তা কখনোই আমার স্বাধীনতার পথে সত্যিকার বাধা নয়। এভাবে অপর ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা সীমিত ও বিনষ্ট করে।

ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বাধা আসতে পারে এমনটি মেনে নিয়ে ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতাকে রূপায়িত করতে পারে। এ পরিস্থিতির সম্পর্কে আলোচনা করে জাঁ-পল্ সার্ত্রে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, স্বাধীনতা একটি পরিস্থিতিতেই সম্ভব, আবার স্বাধীনতাই পরিস্থিতিকে অর্থ দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "যে দাস নিজের দাসত্ব সম্পর্কে অবগত নয়, এবং বোবা বশ্যতায় যে আবদ্ধ সে শুধুই দাস। যে দাস সন্ধি করেছে তার অবস্থানের সাথে এবং উপভোগ করছে নিজের দাসত্বকে সে হচ্ছে চাটুকার ও পরগাছা। কিন্তু যে দাস নিজের

---

104 বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), Rv-cj mv‡Î, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ১৫৫।

অবস্থানকে জানে এবং মেনে না নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, সেই হচ্ছে বিপ্লবী।"[১০৫] এখানে লেনিন মূলত, মানুষের স্বাধীনতার প্রায়োগিক বাস্তবতার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি যে বিপ্লবের কথা বলেছেন এ বিপ্লবী চেতনা স্বাধীনতার সাথে মানুষের দায়িত্বকে সার্ত্রে যুক্ত করেছেন। কারণ মানুষ স্বাধীনতায় দণ্ডিত হয়ে সমস্ত জগতের ভার বহন করে। পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটে, তার সবকিছুর অর্থ মানুষের কাছ থেকে আসে। মানুষই তার কাজের মধ্য দিয়ে জগৎকে গড়ে তোলে।

এভাবেই মানুষ দেখে এবং উদ্বেগের সাথে লক্ষ করে যে, সে এমন একটি সত্তা, যে নিজের সত্তার ভিত্তি নয়, অপর ব্যক্তি কিংবা জগতের সত্তার ভিত্তিও নয়, অথচ তাকেই সত্তার অর্থ নির্ধারণ করতে হয়। মানুষ উদ্বেগের মধ্যে উপলব্ধি করে যে এমন একটি দায়িত্বে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যে দায়িত্ব তার পরিত্যক্ত অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত, সে স্বাধীনতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে এবং এ প্রকাশের মধ্যেই তার সত্তা বর্তমান। কিন্তু সার্ত্রে একথাও বলেছেন, এ উদ্বেগের হাত থেকে আমরা আত্মবঞ্চনায় পালাতে চেষ্টা করি। 'সত্তা ও শূন্যতা' গ্রন্থে সার্ত্রে যে স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে ব্যক্তি অস্তিত্ব, চেতনা, শূন্যতা, ব্যক্তির পরম লক্ষ্য ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। অতএব দেখা যায়, মানবজীবনে স্বাধীনতাভিত্তিক কাজের মধ্য দিয়েই নিজেকে গড়ে তোলে। মানুষ তার নিজের অবয়ব নিজেই সৃষ্টি না করলেও তার জীবনের স্বরূপ ও ভাগ্য কী রকম হবে তা সে নিজেই তৈরি করে এবং সে তা করে তার স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কাজের মাধ্যমে।

---

105 ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ceÜ mgM 1, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৭৯।

২.৩ gvbeRxe‡b Ø›Ø I nZvkv

ব্যক্তিমানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে দ্বন্দ্ব ও হতাশা। তাই এ দুটি সত্তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী। দ্বন্দ্ব ও হতাশামুক্ত মানুষের সংখ্যা এ জগতে বিরল। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। তাই দ্বন্দ্ব বলতে মানব মনের দুটি ইচ্ছা (এটি করলে শুভ হয়, ওটা করলে অশুভ হয়), যা পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠে কিংবা যখন ব্যক্তির ইচ্ছা এবং বাইরের জগতের শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়, তখন ব্যক্তির মনে যে আবেগিক মনোভাব দেখা দেয় তাকে বুঝায়। দ্বন্দ্ব কীভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে এবং মানসিক বিকাশের জন্য কাজ করে। এ প্রসঙ্গে A.D. Lindsay একটি যুক্তিসংগত উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে যে,

> …a man should inquire whether it would be better to take for the driver of his charior, one who knows how to drive, or one who does not know; or whether it would be better to place over his ship one who knows how to steer it, or one who does not know; or if men should ask respecting matters which they may learn by counting, or measuring, or weighing; for those who inquired of the Gods concerning such matters he thought guilty of impiety, and said that it was the duty of men to learn whatever the Gods had enabled them to do by learning, and to try ascertain from the Gods by augury whatever was obscure to men; as the Gods always afford information to those to whom they are (rendered) propition. [106]

অস্তিত্ববাদী দর্শনে দ্বন্দ্বকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে নিজের অন্তর্মুখী চেতনার মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুভব করে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হয়। এজন্য দ্বন্দ্বকে অন্তর্মুখী চেতনার বিকাশের উৎস মনে করলেও আবার কখনো কখনো হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় এবং সিদ্ধান্ত নিলেও তার ফল নেতিবাচক হয় তখনই দ্বন্দ্বকে অন্তর্মুখী চেতনার বিকাশের অন্তরায় মনে করা হয়। দ্বন্দ্বকে অন্তর্মুখী চেতনার বিকাশের মূল হিসেবে ব্যবহার করাতে না পারলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে Robert W. White & Norman F. Watt বলেন, "... by their very nature the phenomena seemed to defy understanding . Moreover, the really good observer

---

106 A.D. Lindsay, Plato & Xenophon, Socratic Discourse, London, J.M. Dent & Songs Ltd, 1954, p. 21.

was likely to be baffled by the wide range of individuals differences. "[107] এখানে স্বাধীন পর্যবেক্ষককে প্রথমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দেখা যায়। কেননা ব্যক্তি তার কোনো বিষয় নিয়ে যখন মানসিকভাবে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তখন সে তার নিজ অস্তিত্ব অনুভব করে এবং বিভিন্নভাবে দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এজন্য দ্বন্দ্ব অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি অপরিহার্য বিষয়। যেমন, ব্যক্তি তার নিজের পছন্দের পাত্রী বিবাহ করবে নাকি তার পিতামাতার পছন্দের পাত্রীকে বিবাহ করবে? অনুরূপভাবে সার্ত্রে দ্বন্দ্বময় অবস্থায় উদাহরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, না মায়ের সেবা করবে। এই নিয়ে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে, ব্যক্তি নিজেই এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করবে। এতে সঠিক নির্বাচন না করতে পারলে তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, দ্বন্দ্ব থেকে হতাশা জন্মলাভ করে। এজন্য মানুষের কাম্যবস্তু যখন তার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন তাকে বলা হয় হতাশা। ব্যক্তি নিজস্ব নির্বাচন করার পর হতাশার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। নির্বাচন বা পছন্দই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হতাশার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে Ronald Grimsley বলেন,

> …in spite of existential aspect, Marcel's thought tends to lay its main emphasis not upon the notion of freedom (although freedom does play, as we shall see, an important role in his work) but upon man's participation in being. He does not dwell upon the idea of a freedom which separates man from being and isolates him with the intolerable burden of being responsible for his own choices, for he prefers to accentuate the idea of a human existence which returns to and indentifies itself with the being by which it is encompassed.[108]

এখানে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের দুই বা ততোধিক বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হতাশা নামক অনুভূতির জন্ম হয়। এগুলো হলো মানব অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মানব অস্তিত্ব গঠনে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে। তাই জাঁ-পল্ সার্ত্রে এ বিশেষ আবেগের অনুভূতি হিসেবে দ্বন্দ্ব ও হতাশা ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করে উদ্যম, মনোনয়ন, দায়বদ্ধতা কাজে লাগিয়ে অস্তিত্ব তৈরি করার কথা বলেন। কিয়ের্কেগার্ড স্পষ্টতই অনুভূতিকে অস্তিত্বের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিমানুষের অনুভূতির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব ও হতাশা কাজ করবে তখন সে তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবে। মানবজীবনের বেঁচে থাকা এবং অস্তিত্বশীল হওয়া এক ও অভিন্ন নয়। কেননা মানুষের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র আমি (প্রবলভাবে ষড়রিপু-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) যখন

---

107 Robert W. White & Norman F. Watt, *The Abnormal Personality*, New York, The Ronald press company, 1973, p. 13.

108 Ronald Grimsley, op. cit., p. 195.

কাজ করে, তখন এ ধরনের আমিকে বেঁচে থাকা বলে। “আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আংশিক বা খণ্ডিত দৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ অনুভূতি আমাদের গ্রাস করছে। এর থেকে পরিত্রাণ সম্ভব কেবল একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক জগৎদৃষ্টি ও জীবনবোধ সমৃদ্ধ দর্শন নির্দেশিত জীবনাচারের মাধ্যমে।”[১০৯] এখানে মানুষ সংকীর্ণ অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকবে তা কাম্য নয়। যথার্থ মানুষ হলো এক বৃহৎ মানবসত্তা, যার বাস্তবত অস্তিত্বশীল এবং যার জীবন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে উপস্থাপিত করে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যক্তিমানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব (ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বৃহৎ স্বার্থ) এবং স্বার্থ ভ্রষ্ট হলেই নেমে আসছে হতাশা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। এ উপলব্ধিই ব্যক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে করে তোলে অস্তিত্বশীল। তাছাড়া তার মধ্যে ভাবাবেগ স্বজ্ঞাত অন্তর্মুখিতার মাধ্যমে বিচারবিশ্লেষণ করে যে ফলাফল বের করে তার দ্বারা সে হয় নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রক, তার মূল্যসমূহের স্রষ্টা। এ ধরনের ব্যক্তির জীবনী শক্তি যেসব বৈশিষ্ট্য বহন করে সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অস্তিত্ব নিহিত থাকে। হতাশা বা উদ্বেগের মাধ্যমে ব্যক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি আসে। যেমন, আমরা যখন কোনো দ্বিকল্পে বা উভয় সংকটের সম্মুখীন হই তখন আমাদের মনে এক বিশেষ অনুভূতি জাগে, যা পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত। আর এ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের গুরুত্ব বুঝতে পারি। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা ব্যক্তিমানুষ যখন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তখন সেটিকে চেতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর এই চেতনাই ব্যক্তির মধ্যে উদ্বেগ বা হতাশা সৃষ্টি করে। আর এর সাথে যে দুটি বিষয় জড়িত তা হলো মনস্তাপ ও ভীতি। এ দুটি এক ধরনের মনোভাব হলেও এরা অভিন্ন নয়। কেননা ভীতি আসে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ভয় থেকে যা আমাদের জীবনের প্রতি হুমকি।

যে ভয় ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের জন্য দায়ী, সে ভয়কে জয় করতে চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদের একটি বক্তব্যকে বিবেচনায় নেওয়া যায়। তিনি বলেন, "...a life and death struggle for survival develops and those individuals which by accident are better equipped for this struggle survive. By this natural selection new species evolve. Thus purely mechanical forces gradually produce, over millions of years, all the organisms we know, and in the end man. "[110]

---

109 আনিসুজ্জামান, AvPvh wb¤¢‡K I ‘kb I wekkwš Í, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৮: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ. ৯৫।

110 Paul Roubiczek, *Existentialism for and against,* London, Cambridge at the University Press, 1966, p. 21.

পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে নতুন প্রাণের মৃত্যু হচ্ছে। জীবের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সে কারণে নিয়ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে চলেছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরামহীন প্রতিযোগিতা। যারা পরিবেশের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে তারাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। যারা পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এ ধারাকে বলা হয়েছে যোগ্যতমের জয়। এ যোগ্যতম ব্যক্তিমাানুষই নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। তার এ উক্তির মধ্যে উত্তম ব্যক্তিই হলো যোগ্যতম ব্যক্তি, যা সার্ত্রে দর্শনে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষ হিসেবে পরিচিত, যিনি সব ধরনের ভয়কে জয় করার জন্য স্বাধীনতা ও আত্মগত বিচারবিবেচনার উপর গুরত্বারোপ করেন। এ আত্মগত বিচার দ্বারা মানুষ তার জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ভয়কে জয় করে সব পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপখাওয়াতে পারবে এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে। আর মনস্তাপে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু আমাদের যথার্থ অস্তিত্বের সচেতনতা থেকে এর উৎপত্তি। যেমন, একজন ছাত্র ও ঔষধ ব্যবসায়ী দু'জনের মধ্যে মনস্তাপ তৈরি হবে। যখন ছাত্রটি কোনো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফেল করবে তখন সে নিজেই উপলব্ধি করে পূর্ববর্তী সময়গুলো কীভাবে নষ্ট করছিল। এ ধরনের উপলব্ধির ফলেই তার মধ্যে মনস্তাপ তৈরি হবে। আর ভয় তৈরি হয় বেদনাদায়ক কোনো কথা অনিষ্টকর বাহ্যিক বস্তু দ্বারা। যেমন, পিতামাতার তিরস্কার থেকে এবং কোনো ধারালো যন্ত্রপাতি দ্বারা আঘাতের চিন্তা করলে। আর বেশি মুনাফা লাভের জন্য কোনো ঔষধ ব্যবসায়ী যখন ভেজাল ঔষধ তৈরি করে এবং সে ঔষধ খেয়ে কতিপয় শিশুর মৃত্যু ঘটে; তখন যে ঔষধ ব্যবসায়ী এ ভেজাল ঔষধ তৈরি করলো, সে ঔষধ ব্যবসায়ীর মনস্তাপ তৈরি হবে-সে যখন ভাববে, যে সন্তান তার ঔষধ খেয়ে মারা গেছে সে সন্তানের মতো। অন্যদিকে, ভীতি হবে তার ভেজাল পণ্য যখন প্রমাণিত হবে; তাকে সরকার কর্তৃক জেল ও জরিমানা ভোগ করতে হবে। এ ধরনের ভীতি থেকে উদ্বেগ তৈরি হয়। সুতরাং বলা যায়, মনস্তাপ উৎপত্তির পিছনে মানুষের নার্সিসাস মননশীলতা অনেকটা দায়ী। এর দ্বারা মানুষ নিজের সম্বন্ধে আসল ব্যাপারটা জানে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আসলে মানুষ একাকিত্বভাবে তার ইচ্ছানুযায়ী কোনো বস্তুর মূল্য নিরূপণ করে থাকে। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে এ মূল্য একমাত্র ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে এবং জগতের নির্মম বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ব্যক্তিমানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব উদয় হলো তা দূরীভূত হবে মানুষ যখন দৃঢ় সংকল্পচিত্তে তার নঞর্থক ও সদর্থক দিক বিশ্লেষণ করে মূল রহস্যটা ভেদ করে এবং তার একাকিত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা মনে রেখে যথার্থ অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হবে।

মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ব্যক্তি তার অস্তিত্বের সংকেত পেয়ে থাকে। তাই দুটি সমান শক্তিশালী উদ্দীপক যখন একই সাথে উপস্থিত হয়, তখন আমরা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। উদ্দীপকগুলো সমান আকর্ষণীয় হতে পারে, আবার পরস্পর বিপরীতধর্মীও হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উডওয়ার্থ এবং মারকুইস (Wouldwearth and Marquish) বলেন, "Sometimes it refers to a stimulus and sometimes to a response. Sometimes it means the unsurmounted obstacle, or the failure to surmount it, and sometimes it means the subjects reaction failure, especially when that reaction is very emotional. "[111]

উদ্দীপকের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেমন, একজন ভালো ছাত্র যখন লেখাপড়ার শেষে কোনো কাজ না পায়, কিন্তু তার সহপাঠী তার চেয়ে কম মেধা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার জোরে সে জীবনে ভালো কাজ পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তখন তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়। সে ভাববে ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়ে কোনো ক্ষমতাবান লোকের সান্নিধ্য বেশি প্রয়োজন। এ বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমানে ছাত্র সমাজ ওয়াকিবহাল। তাইতো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে একজন ছাত্র অপর ছাত্রকে হত্যা করে। এক রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলকে বিলীন করে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এর ফলে রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠনের কী লাভ হয়? বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ছাত্র সংগঠনের হত্যাকাণ্ড, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার ফলে বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাঁর দর্শন মানবজীবন সম্পর্কে যে শিক্ষা প্রদান করে তা হলো প্রথমে ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্বের যে একটি বিশেষ মূল্য আছে সে সম্বন্ধে সচেতন করে, সে ভাববে, আমার বর্তমান স্বশরীরী দেহযুক্ত অস্তিত্ব যথার্থ অস্তিত্ব নয়। তাই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একা ও নিঃসঙ্গ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এবং জগতের প্রত্যেক ভোগনীয় বস্তু ও অপর মানুষ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে যথার্থ অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য আন্তঃপ্রবাহের দিকে ধাবিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে Jaques Maritain এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, "God does not create essence to which he can be imagined as giving a last rub of the sandpaper of subsistence before sending them forth into existence. God creates existent subjects or supposita which subsist in the individual nature that constitutes them and which receive from the creative influx their nature as well as their subsistence, their existence and their activity. "[১১২]

মানুষ যদি তার দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্বশিক্ষিত হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই রচনা করে। তাহলে উগ্র রাজনৈতিক সংগঠন তাদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে না। সে সবসময় বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করে যাবে-তখন একজন ছাত্র নিজেকে যথার্থ অস্তিত্বশীল করার মাধ্যমে অন্য ছাত্ররা

---

111 Wouldwearth and Marquish, *Psychology;* London, Methuen & Co. Ltd, 1964, p. 375.

112 Jaques Maritain, op. cit., p. 66.

তার আদর্শ অনুসরণ করবে। যার ফলশ্রুতিতে গোটা ছাত্র সমাজে সুষ্ঠু রাজনীতি ধারা চলে আসবে। অন্যদিকে, সে একজন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। একমাত্র আশা যে, সে সিজার হবেই। এ ভাবনা তার জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সে যদি সিজার না হতে পারে তাহলে হতাশা আসবে। এ হতাশার একমাত্র কারণ সিজার না হতে পারা। তাছাড়া, দু'ধরনের হতাশাগ্রস্ত মানুষের কথা বলেছেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড তাঁর রচনায় বলেছেন, এক ধরনের নৈরাশ্য থাকে অবচেতনে। আর এক ধরনের নৈরাশ্য বা হতাশা স্বচেতনার স্তরেই। এ দু'ধরনের হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রসঙ্গে 'দ্যা মিথ অব সিসিফাস' গ্রন্থে আলব্যের কামু দেখিয়েছেন যে, মানুষের জীবন কতটা অর্থহীন।

> এ মিথটি ট্র্যাজিক হয় তার কারণ এর নায়ক হলো সচেতন। তার নিপীড়ন কী হবে, যদি প্রতিটি পদক্ষেপে তার সাফল্যের আশা তাকে উপরে তুলে ধরে? আজকের দিনে একজন শ্রমিক তার জীবনে একই কাজ করে যায়, এ দুর্ভাগ্য অ্যাবসার্ডের চেয়ে কম নয়। কিন্তু যখন সচেতন সেসময় এ দুর্লভ মুহূর্তে এ কেবলই ট্র্যাজেডি হয়ে উঠে। দেবতাদের সর্বহারা, ক্ষমতাহীন ও বিদ্রোহী সিসিফাস জানে তার পুরো দুরবস্থার কথা; তার অবতরণের সময়ে সে কী ভাবে। এও পরিষ্কার যেসময়ে তার পীড়ন তৈরি করতে হয় তার জয়ের মুকুটও একই সময় তৈরি হয়, কোনো ভাগ্য নেই যা অবজ্ঞা দিয়ে উঁচুতে উঠতে পারে না। [১১৩]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, যখন অস্তিত্বশীল মানুষ তার বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে সমাজে কোনো সত্য বা ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন বাস্তব পরিবেশে সৃষ্টি ও ধ্বংস খেলা চলে; যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা। আর এ হতাশাগ্রস্ত মানুষের চিত্র তুলে ধরেন Jean-Paul Sartre'

> … A life, thought Mathieu, "is formed from the future just as bodies are compounded from the void" He bent his head; he thought of his own life, the future had made way into heart, where everything was in process and suspense…He could do what he liked. No one had the right to advise him, there would be for him no good nor evil unless he brought them into being. All around him things were gathered in a circle, expectant, impassive and indicative of nothing. He was alone, enveloped in this monstrous silence, free

---

113 আলব্যের কামু, '¨v wg_ Ae mmmdvm, অনুবাদ, মনোজ চাকলাদার, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, কলকাতা, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ২০১০, পৃ. ৮৪।

> and alone, without assistance and without excuse, condemned to decide without support from any quarter, condemned forever to be free. [114]

ব্যক্তি মানুষের আত্মচিন্তা কোনো ট্র্যাজিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হলে হতাশার জন্ম নেয়। কারণ নিপীড়ন সত্তা যখন আত্মচিন্তার মাধ্যমে নিজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তখনি এ ধরনের বিপত্তি ঘটে। আবার আত্মপ্রচেষ্টা মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ হতাশা অতিক্রম করে নিজেকে অস্তিত্বশীল করে এবং একটি হতাশা ও উদ্বেগ পূরণ হওয়ার পর নতুনভাবে হতাশা সৃষ্টি হয়।

তাই মানবজীবনে কেউ হতাশা নামক স্বরূপ সত্তাকে অতিক্রম করতে পারবে না। কেননা মানুষ সাময়িকভাবে হতাশা দূর করে অস্তিত্বশীল হতে পারে; কিন্তু ব্যক্তি তা একেবারে নির্মূল করতে পারে না। কিন্তু হতাশা ব্যক্তির অস্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। আমরা সবাই জানি, ব্যর্থতাই সাফল্যের উৎস। ব্যর্থ হলেই মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করে কীভাবে এবং কেন সে ব্যর্থ হয়েছে; সে নিজে আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করে তা দূর করার জন্য অনুশীলন করতে থাকে। এক সময় সে ঐ কাজের সাফল্যের মুখ দেখতে পায়। এভাবে ব্যক্তি তার অস্তিত্ব তৈরি করে। তাছাড়া হতাশার অন্যতম কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আচরণ যেমন অলসতা ও অসাবধানতা এবং অপর ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা; যা লক্ষ্যে পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ ধরনের হতাশা দূরীকরণের জন্য ব্যক্তি মহৎ লোকদের জীবন সংগ্রাম অনুসরণ করবে এবং সে ভাববে, মহৎ ব্যক্তিরা কত সাধনা করে জীবনে হতাশাকে কাটিয়ে উঠে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি হয়েছে। যে সত্তা সংগ্রামে লিপ্ত থাকে তাকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার বলেছেন, 'ডাজায়েন'। এ সত্তা মানুষকে সত্য-মিথ্যা বা যথার্থ ও অযথার্থ বিষয়ে জ্ঞানদান করে থাকে। সত্যকে ধারণ করে নিজের জীবনকে গঠন করে। এ সত্তা সম্পর্কে মার্টিন হাইডেগার বলেন, "...Dasein is equally in truth and in untruth. Open to beings and to its own being possible, Dasein nonetheless relinquishes this openness in exchange for the security of whatever they say is true. "[115]

জগৎস্থিত সত্তা ব্যক্তির প্রশ্নাকারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তি চিন্তাশক্তিকে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করলে তা অব্যশই জ্ঞানীয় হবে। এ ধরনের সত্তা সত্যকে অনুশীলন করে এবং মিথ্যাকে পরিহার করে। সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী সত্তা অধিকারী মহৎ ব্যক্তিরা সব ধরনের হতাশাকে জয় করে। অস্তিত্ববাদ দর্শনে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের সময় চেতনা অন্তর্মুখী

---

114 Jean-Paul Satre, *The Age of Reason,* trans. by Eric Sutton, New York, Bantam Books, 1999, p. 275-76.

115 Martin Heidegger, op. cit., p. 113.

হয়। যা দ্বারা ব্যক্তিমানুষ একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব ও হতাশা অনুভব করে। অন্যদিকে, তেমন ঐ একই চেতনা দ্বারা হতাশা বা উদ্বেগ বিলুপ্ত করে ব্যক্তি নিজেকে অস্তিত্বশীল করে তুলতে পারে। এজন্য হতাশা বা দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে হতাশার কারণ চিহ্নিতকরণ, দৃঢ় পদক্ষেপ, ধৈর্য, সাহসিকতা ও একাগ্রচিত্ত। এ ধরনের গুণাবলি ব্যক্তিকে আত্মশক্তি অর্জনে সাহায্য করে। ফ্রেডারিক নীৎশের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "… The saint exercises that defiance of oneself which is a near relation to lust for power and which gives the sensation of power even to the most solitary…"[116] হতাশা ও নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্য একাকিত্বভাবে যথার্থ কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এ সম্পর্কে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেছেন, "মানবজীবনে খারাপ দিকটায় অধিক গুরুত্বারোপ করাই আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে মানুষ অনিবার্যভাবে খারাপের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাই সেগুলোকে দমন করার জন্য দৃঢ়বদ্ধ নিয়মকানুন অব্যশই থাকবে, অন্যথায় আমরা নৈরাজ্য পাব।"[১১৭]

এ থেকে বলা যায় যে, ব্যক্তিমানুষের প্রাথমিক মানসিক চেতনার স্তরটা থাকে নেতিবাচক, যা মানুষকে ধ্বংস ও হতাশার দিকে নিয়ে যায়। তাই যে চেতনা মানুষকে অশুভ দিকে পরিচালিত করে ঐ চেতনার বিপরীত দিকটি আবার মানুষকে শুভ কাজের দিকেও চালিত করে। তবে এর জন্য দরকার ব্যক্তির ভালো কাজ করার অঙ্গীকারপূর্ণ মনোভাব, যা চেতনাকে ইতিবাচক দিকে চালিত করবে এবং নেতিবাচক বিরোধী শক্তি বা খারাপের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

---

116 Nietzsche, *The Man and his philosophy*, trans. R. J. Hollingdale, London, Routledge & Kegan Paul, 1965, p. 148.

117 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, A¯ÍZev‘ I gvbexq Av‡eM, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২।

2.4 ev¯ÍemËvi weeiY (d¨vw±wmwU) I h_v_© Aw¯ÍZ¡

চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে আত্মজ্ঞান, যার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি যথার্থ অস্তিত্বশীল হয়। আর মানুষ যথার্থ অস্তিত্বশীল হলেও তাকে দেহ ধর্মের কতকগুলো শর্তকে মেনে নিতে হয়। যেমন, বৈষয়িক স্বার্থ, কামনাবাসনা, ভোগের ইচ্ছা, স্থান, পরিবেশ ও সংস্কৃতি এগুলোকে ধরে মানুষের আত্মপ্রকাশের কাজ চলে, যাকে সার্ত্রে বলেছেন বাস্তবসত্তা বা ঘটনার বিবরণ। যা কখনো মানুষ অস্বীকার বা নির্বাচন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha বলেন, "...If man is the sum of his acts, confronting a world of concrets objects unmediated by the divine power, he suffers the agony being alone and the anguish of being totally free to act. Lacking an essence, he makes himself what it is through his action which may be a conscious acceptance of responsibility (commitment) or a willing evasion of it (bad faith). "[118]

অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তিসত্তার দুটি দিক আছে, একটি বাস্তবসত্তা এবং অপরটি যথার্থ সত্তা। বাস্তবসত্তা বিবরণকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয় বৈষয়িকতা। যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির সাথে ছলচাতুরি থাকে। অন্যদিকে, যথার্থ অস্তিত্ব হলো বৈষয়িকতার বাইরে অঙ্গীকারের মাধ্যমে নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রথমটি দিয়ে ব্যক্তি শুধু দেহস্থিত কামনা লাভ করতে চায় এবং সবসময় আপন স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, যার মূল উৎস জীবপ্রকৃতিতে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিসত্তা সকাম কর্মে বা ভোগীয় জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেটি হচ্ছে বাস্তবসত্তা (যাকে বলে নিছক অস্তিত্ব)। যেমন, সার্ত্রের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিমানুষ সামাজিক প্রথা বিশ্বাসী, ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন ও যে সমাজের রীতিনীতি প্রথা অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করে এবং তার আচরণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, সে ব্যক্তি মানুষের সত্তা হলো বাস্তব বা দশাগ্রস্ত সত্তা। আর যে ব্যক্তিসত্তা এ জগতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করছে সকাম বা দেহস্থিত কামনার ঊর্ধ্বে উঠে মহৎ গুণাবলি চর্চা করে সেটি হলো যথার্থ সত্তা। এ দুই সত্তার মধ্যে একটিকে বলা হয় বৈষয়িক বা অযথার্থ সত্তা। অপরটি হলো যথার্থ সত্তা। যে ব্যক্তি মহৎ গুণাবলি ধারণ করে এবং যার ভাবনা পৃথিবীর উৎকর্ষসাধন। সেই মহৎ ব্যক্তি মানুষকে শুধু জানার মাধ্যমে পাওয়া যায় না; তাকে পেতে হবে হয়ে ওঠা মানুষের মধ্যে অর্থাৎ একজন ব্যক্তিমানুষ মহৎ গুণাবলি কী, তা জানে কিন্তু নিজ জীবনে সেই মহৎ গুণাবলি অনুশীলন করে না। যদি সে ব্যক্তি মহৎ গুণাবলি অনুশীলন না করে তবে হয়ে ওঠার বা অস্তিত্বশীল মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তাছাড়া মহৎ বৃত্তিগুলো জন্ম থেকে মানুষের মধ্যে প্রোথিত থাকলে ব্যক্তিমানুষকে নিজের প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম না করে শুধু গা ভাসিয়ে নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করতে পারত। সুতরাং অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই হচ্ছে নিজের ভিতরে প্রবৃত্তিকে (Propension) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকাশ

---

118 Sudeshna Chakravarti Chinmoy Guha, op. cit., p. 113.

ঘটানো। এ প্রসঙ্গে Jean-Paul Sartre বলেন, "…The basic concept which is…engendered, utilize the double property of the human being…is at once a facticity and a transcendence. "[119] এখানে ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব দশাগ্রস্ত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে একজন যথার্থ মানুষে পরিণত হওয়াকে বলা হয় অতিবর্তিতা (Transcendence)। প্রত্যেক ব্যক্তির বাস্তবতা তার ষড়রিপু দমন করে ও ক্ষুদ্র আমি সত্তাকে পরিত্যাগ করে বৃহৎ আমি সত্তার সাথে একত্র হতে চায় সেই ব্যক্তিমানুষই যথার্থ অস্তিত্বশীল। সুতরাং হয়ে উঠার সংগ্রামই যথার্থ অস্তিত্ব নির্মাণ করতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে Jaques Maritain বলেন, "…I have spoken of the existential (practical existential) character of the judgment of conscience whose truth is measured by the rightly orientated voluntary dynamism of the subject. "[120]

তাছাড়া ব্যক্তিমানুষের জীবনের সাথে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে অজস্র মানুষ তথা প্রাণ ও বস্তু। এটি ব্যক্তিকে বিবেক ও বুদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, আপন সিদ্ধি লাভে উৎসাহ প্রদান করে। মানুষের এ ধরনের অযথার্থ অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে তৈরি করার বিষয়টি কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এজন্য অস্তিত্ববাদীরা বলেন, আমি আছি-এ বোধ থেকে মানুষকে শুরু করতে হবে। একই সাথে মানুষকে এও জানতে হবে, এ জগতে আরো চেতনাযুক্ত মানুষ আছে। তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ জানতে হবে। সার্ত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা বাস্তব জগতের উপাদান সংগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্বতা তৈরি করার কথা বলেছেন। জগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে তা চেতনার দ্বারা বুঝতে হবে। আমরা জানি, মানুষের অস্তিত্ব আর বস্তুর অস্তিত্ব এক নয়। বস্তুর বিশিষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা আছে; কিন্তু মানুষের বিশিষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করে অস্তিত্ববাদীরা মানুষের চেতনাকে বস্তু থেকে আলাদা করেছেন। কেননা ব্যক্তিমানুষ যখন জানতে পারে কীভাবে কোনো বিষয় বস্তুর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়। এটি করতে গেলে ব্যক্তির ভিতরকার চেতনা সত্তার জিজ্ঞাসা দ্বারা জাগ্রত করতে হয়। আর তখনই মানুষ বস্তু থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে E. D. Klemke, A. David Kline, Robert Hollnger বলেন, "…If I ask myself how to judge that this question is more urgent than that, I reply that one judges by the actions it entails. I have never seen any die for the ontological argument. "[121]

অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমানুষরা আত্মজ্ঞান ও স্ববিচারের মাধ্যমে সবকিছু জানার মাধ্যমে বস্তুর মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায়, কিন্তু মানুষ তা পারে না, সে শুধু পারে চেতনাসম্পন্ন হয়ে বস্তুর প্রভাব থেকে আলাদা হতে এবং কোনো

---

119 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness,* op. cit., p. 56.

120 Jaques Maritai, op. cit., p.62.

121 E. D. Klemke, A. David Kline, Robert Hollnger, *Philosophy The Basic issues*, New York, St. Martin's press, 1986, p. 337.

বিষয় ও বস্তুর মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আছে তা জানতে পারে। অনস্তিত্বশীল মানুষ হচ্ছে সম্মুখে যা দেখে তাই সে বিশ্বাস করে অর্থাৎ ফ্যাক্টিসিটির মতো সে যা তাই, সে নিজেকে কখনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না এবং নিজেই নিজের অস্তিত্ব নির্মাণ করতে পারে না; বরং জন্মলগ্ন থেকে সে যেটুকু অস্তিত্ব নিয়ে এসেছে তাই দিয়েই নিজেকে পরিচালিত করে। এজন্য জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেছেন, "Facticity is both a limitation and a condition of freedom. It is a limitation in that a large part one's facticity consists if thinks one couldn't have chosen birthplace etc. But a condition in the sense that one's values most likely will depend on it. "[122] মানুষের দশাগ্রস্ত (Facticity) হচ্ছে স্থির স্বভাব, সে যা তাই, নিছকসত্তা ও নিরেট সত্য। যাকে জাঁ-পল্ সার্ত্রে দর্শনে বলা হয়েছে স্বহেতু সত্তা। কেননা এ স্বহেতু সত্তার মতো স্থির স্বাধীন সত্তা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করলেও এটির যথার্থ প্রয়োগ যদি না করতে পারে তাহলে সে হবে বস্তুর মতো, যার কোনো বিষয়ে মতামত বলে কিছু থাকবে না, সে সবকিছুই ভাববে বিধাতার সৃষ্টি এবং সে নিজ স্বাধীন সত্তা দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ভোগীয় মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হবে। তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলে কিছুই থাকবে না এবং তার দ্বারা সমাজের কোনো কল্যাণ আসবে না। স্বাধীন সত্তার যথার্থ প্রয়োগই ব্যক্তিমানুষকে করে তোলে অস্তিত্বশীল। এর জন্য প্রয়োজন কোনো লক্ষ্যকে স্থির করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সবসময় লক্ষ্যাভিমুখী ক্রিয়া (Praxis action) করা। এ ধরনের মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়, যা দৈহিক জ্যোতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে Martin Heidegger বলেন, "… he has always expressed opinions about who he is. Until recently occidental man has consistently described himself as the rational animal, the living creature that thinks and has knowledge. "[123]

মানুষ যদি সব সময় দৃষ্টি রাখে সে কী করছে, কী ধরনের চিন্তা করছে, কার সাথে কী ধরনের কথা বলছে, কেন বলছে, এর সুবিধা ও অসুবিধা কী? অর্থাৎ সে নিজের জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে সব সময় নিরীক্ষণ করে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে তাহলে মানুষের মধ্যে স্বাধীনচেতনা জাগ্রত থাকে এবং একইসাথে স্বাধীনতাকে ইতিবাচক অর্থে সীমিতও করা হয়। কেননা মানুষের পক্ষে যেহেতু একসাথে সবগুলো কাজ করা সম্ভব নয়, সেহেতু স্বাধীনতাকে কাজের শৃঙ্খলা আনয়ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই স্বাধীনতাভিত্তিক কাজের মুহূর্তটা ভালোভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তবে মানুষের কাজের বাধা সৃষ্টি করে দৈহিক শর্তগুলো, যা মানুষের স্বাধীনতার গতি ব্যাহত করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of Man' গ্রন্থে দ্বৈতসত্তা কথায় বলেছেন যে, 'Biological Existence' এর আধারে মানুষ আত্মপ্রকাশ করে, তার সৃজনশীল

---

122 Jean- Paul Sartre, *Being and Nothingness,* op. cit., p. 489.

123 Martin Heidegger, *Basic Writings,* op. cit., p. 90.

সত্তার প্রকাশ না করে শুধু দৈহিক চাহিদা অনুসারে কাজের গতি সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তিসত্তা দৈহিক শর্ত নিয়ে পৃথিবীতে এলেও মানুষ তার নিজস্ব Plan, Project, Device আছে; যার সাহায্যে সে অস্তিত্বশীল জীবনটা গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "...to disregard one's facticity when one in the continual process of self making, project oneself into the future, would be to put oneself in denial of themself and would thus be in authentic. "[124] পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তার পরিকল্পনা ও তার নিজস্ব ছক নিয়ে কার্যসম্পাদন করে। তিনি আরো বলেন যে, এ কার্যসম্পাদনের গতি অসীম ও অনন্ত। মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনাই হচ্ছে কোনো কিছু হতে হওয়ার সম্ভাবনা। আর এ নতুন কিছু হয়ে ওঠার হওয়ার সম্ভাবনাই আমার সীমাহীন অস্তিত্ববোধের চেতনা। অস্তিত্ববোধের চেতনা ব্যক্তিকে যথার্থ অস্তিত্বশীল করে তুলে। এজন্য মানুষের প্রথম প্রয়োজন নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করা। আর স্বীকার করার মাধ্যমে ব্যক্তি জগতে সকল অস্তিত্বকে বুঝতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "দিব্য পুরুষের নিবাস বস্তুর স্বরূপসত্যে। অতএব নিজেকে তিনি নিত্য অনুভব করেন পরা সংবিতের প্রকাশরূপে।"[১২৫] এ উক্তির মধ্যে দিব্য পুরুষ সার্ত্রের দর্শনে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তা। তার হেতু যথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তি দিব্য পুরুষের মতো বস্তু, ঘটনা, নিজের ও অপরকে শুধু দেখেনই না; বরং এগুলোর স্বরূপকে অনুভব করেন তার সংবিতের মধ্যে। এ স্বরূপ চেতনা হলো ব্যক্তির নিজস্ব। এ প্রসঙ্গে Martin Buter বলেন, "…of the two who have taken up Nietzsche's expression of the death of God. One, Sartre, has brought it and himself and absurdum through his postulate of the free invention of meaning and value. "[126]

এজন্য যথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তিরা নিজস্ব স্বাধীন সত্তা দ্বারা সবকিছু সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের মধ্যে একটি মানদণ্ড তৈরি করে যে মানদণ্ড দিয়ে সব মানুষের অস্তিত্বের মাত্রা কতখানি তা নির্ণয় করা যায়। যে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ব্যবহার করে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভাবে তার অস্তিত্ব নিজস্ব স্বাধীন সত্তার মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত না হয়ে; বরং সকাম কর্ম বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হবে। এদেশে বেশিরভাগ মানুষ স্থূল ভোগীয় স্তরের মধ্যে থাকার প্রবণতা বেশি থাকে বলে নিজের ভিতরে ও বাইরে সব অনুভূতি ও প্রবণতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিতে পারে না, এদেরকে আমরা তাকে অনস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষ বলে থাকি। কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যে মানুষগুলো সমাজে রয়েছে তারা তাদের সব অনুভূতি ও প্রবণতার ওপর সদাচেতন থাকে বলে আমরা তাদেরকে অস্তিত্বশীল বা যথার্থ ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। এ যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমানুষের মধ্যে পার্থক্য করে John Wild বলেন, "... The

---

124 Ibid, p. 481.

125 শ্রীঅরবিন্দ, f‘e¨-Rxeb, ভারতবর্ষ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৩৮।

126 Martin Buter, *Eclipse of God*, trans. by Maurice Friedman et al, New York, Harper Torch books, 1957, p. 314.

clearest and most penetrating description of the impersonal aloofness which dominates our daily life with others is Heidegger's famous account of das man, oneness, in sein and zeit. "[127] অস্তিত্বশীল মানুষের জীবন সার্থক ও সুন্দর হবে তখনি, যখন সে তার স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগ করে একজন কল্যাণকামী মানুষরূপে নিজেকে প্রতিভাসিত করবে এবং বিপর্যয় পরিস্থিতিতে ভেঙে না পরে নিজের স্বাধীন শক্তিকে কাজে লাগাবে। আর এটি সম্ভব প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা নামক শক্তিটি আছে বলে। যে তার স্বাধীন সত্তাকে চারপাশের পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রশ্ন করে যে, এ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে গেলে আমার কতখানি অস্তিত্ব বিলীন হতে পারে বা কতখানি অস্তিত্ব সৃষ্টি হতে পারে এ বিষয়ে সে ভাবে। মনের এ অবস্থা কাটিয়ে ব্যক্তিমানুষটি পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। এসব ব্যক্তি সম্পর্কে Jean-Paul Sartre বলেন, "**…**I was too infuriated by the mental reservation, the hypocrisy, and not to mince words, the revolting stench of the obituaries devoted to him, for me to dream of emphasizing here the things which separated us from him. It is much better to recall the priceless gifts he bestowed upon us. "[128]

যারা দৈহিক শর্ত পূরণের জন্য অনুরাগী হয়ে বেঁচে থাকে তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। কেননা তাদের মধ্যে বিনয়ের বিপরীত শক্তি উগ্রতা কাজ করে এবং নিজেকে হামবড়া মনে করে অপর ব্যক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করে হেয় প্রতিপন্ন করে। এর জন্য তারা জীবনে মানুষের কোনো ভালোবাসা ও সহযোগিতা পায় না। কিন্তু দৈহিক শর্তগুলো পূরণের পর নিজেকে সঠিক মানুষে রূপান্তর করে, নিজের পাশবিক শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে পরিণত করবে। তারাই পৃথিবীতে এমন কিছু নমুনা রেখে যাবে, যা পরবর্তীতে প্রজন্ম তা অনুসরণ করবে। আর যদি বিপরীত হয়ে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করে এবং ব্যক্তি যদি তার সম্ভাবনাকে না বুঝে তাহলে তার জীবন হবে ফ্যাক্টিসিটি দ্বারা আবৃত। সার্ত্রে ফ্যাক্টিসিটি দ্বারা আবৃত সত্তাকে অতিক্রম করে কল্যাণমূলক সত্তা ধারণ করার পরামর্শ দেন।

সার্ত্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত রূপ হবে, "ব্যক্তিমানুষ স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা সঠিক কাজটি করবে, যা সমস্ত মানুষের পক্ষে কল্যাণ হবে।"[১২৯] অনুরূপভাবে এদেশের মানুষের প্রকৃত চেহারা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে ড.

---

127 John Wild, *The challenge of existentialism*, Indian university Press, Bloominggton & London, 1966, p. 130.

128 Jean-Paul Sartre, *Situations,* Translated by George Braziller, New York , Park Avenue South, 1965, p. 63-64.

129 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, 'kb I mwnZ¨, ভাষান্তর, মৃণালকান্তি ভদ্র, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ.১৯৯।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর 'evsjv‡'‡ki gbl¨‡Zi msKU' গ্রন্থে বলেন, "স্বচ্ছ চিন্তা, মহৎ অনুভব আর ঠিক কর্ম সম্পাদনকারী হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানুষ।"[১৩০]

মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যেই দেহের শর্তগুলো পার হয়ে নিজেকে চায় প্রকাশ করতে। আর এ প্রকাশের উৎস হলো তার অস্তিত্ব থাকা এক অসীম ও অনন্ত অস্তিত্ববোধ যাকে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যতত্ত্বে উল্লেখ করেন, "আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এ যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি না। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।"[১৩১] এখানে আমি আছি, আমি সত্যি। তারপরে দেখছি যেটুকু আছি এটুকুতে আমি শেষ নই, যা আমি হব, যা এখনও হইনি তা আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি, না ছুঁইতে পারি; কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে আছে। একে আমি বলি শক্তি। যারা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে সর্বোচ্চ বলেছেন তারা মূল্যের জগৎকে গ্রহণ ও বর্জনের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দ ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। মানুষের মধ্যে যে নৈতিক বৃত্তিগুলো রয়েছে (যেমন, চেতনা, বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছা ইত্যাদি) এর সত্য প্রকাশিত হবে যখন এগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে কার্য সম্পাদনে যুক্ত হবে। আর জাঁ-পল্ সার্ত্রের মধ্যে এ বৃত্তিগুলো প্রয়োজনীয় বিকাশ সাধিত হয়েছিল বলেই তাঁর নিজ দেশের অন্যায় স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে আলজেরিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং নোবেল পুরস্কারের মতো লোভনীয় একটি বিষয়কে অস্বীকার করেছিলেন। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক শর্তগুলো অতিক্রম করতে পারে না বিধায় সে একজন অযথার্থ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিণত হয়। তবে এরূপ ব্যক্তি মানুষেরা বাস্তবতা বহির্ভূত কল্পনাবিলাসী হয়। এ প্রসঙ্গে Reinhardt Grossmann বলেন, "… individual person for example, Hamlet does not have being, because he is not one person. He is imagined to have a whole lot of properties, (attribute) but he does not have these properties. "[132]

এসব ব্যক্তি জাঁ-পল্ সার্ত্রের দর্শনে অযথার্থ অস্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ ধরনের অস্তিত্বের আরো দুইটি কারণ রয়েছে ব্যক্তির অলসতা ও অস্থিরতা, যা ব্যক্তিমানুষের পতনের জন্য দায়ী। ব্যক্তি নিজ ও অপর ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক সিদ্ধান্ত ও নিরন্তর কর্মমুখী হয়ে নিজেকে পরিচালিত করলে ব্যক্তির উন্নতি অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে Franz Kafka বলেন, "There are two cardinal sins from which all the others spring; impatience and laziness. Because of impatience we were driven out of paradise, because of laziness we cannot return. Perhaps however, there is only one cardinal

---

130 ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, evsjv‡'‡ki gbl¨‡Zi msKU, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ১৪।

131 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, iex›'-iPbvewj (সম্পাদিত), 12bs LÐ; ঢাকা, ঐতিহ্য প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৪৯৫।

132 Reinhardt Grossmann, *The Existence of the World*, London and New York, Routledge, 1994, p. 93.

sin; impatience. Because of impatience we were driven out, because of impatience we cannot return."[133] মানবজীবনে দুটি সত্তা দ্বারা পরিচালিত হলেও এর মধ্যে নেতিবাচক সত্তাই ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য দায়ী। জাঁ-পল্ সার্ত্রের এ অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানবজীবনে ব্যক্তিমানুষ চেতনার সাহায্যে তার উদ্বেগ, হতাশা, অলসতা ও আরাম-আয়েশ উপলব্ধি করে এবং দূরীকরণের জন্য এক ধরনের অঙ্গীকারপূর্ণ সত্তার আবির্ভাব ঘটিয়ে তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে। তবে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় আসে, তখনই সে ব্যক্তিমানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। হতাশাগ্রস্ত মানুষের চেয়ে সে ভালো আছে, এ ভাবনা চেতনা নিয়ে আসলে তার ভিতরে উদ্বেগ ও হতাশা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। তারপর মানবজীবনে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে অযথার্থ বা মেকী স্বভাবের দিকে প্রবণতা বেশি থাকে। এ প্রসঙ্গে Ronald Grimsley উল্লেখ করেন, "...These three features-chatter, curiosity and ambiguity- are typical aspects of unauthentic everyday life and in spite of their superficiality reveal of a fourth 'existential'- the fallenness (verfallenfeit) of the Dsein. "[134]

ব্যক্তির সত্তা স্বাধীনতাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করে অনেক বিকল্প কর্মপন্থার মধ্যে ফলাফল চিন্তা করে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম নির্বাচন করে। আর এ নির্বাচনই তার ভবিষ্যৎ নিয়তি বা যথার্থ কর্ম করতে সহায়তা করে। তাছাড়া এ স্বাধীনতার সাহায্যে ব্যক্তিমানুষ অনিষ্ট বিষয়গুলোকে পরিহার করে শুভকে নির্বাচন করে এবং সে কাজ করার জন্য সে একই সাথে হবে অঙ্গীকারবদ্ধ। কেননা কাজের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হলে কোনো কাজকে সার্ত্রে স্বাধীন কাজ বলে আখ্যা দিতে নারাজ। যেমন, মাছি নাটকে সার্ত্রে দেখিয়েছেন অরেস্টিস অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আরগসবাসীকে নিষ্ঠুর শাসকের শাসনের হাত মুক্ত করার জন্য যে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েছিলেন; তা জাঁ-পল্ সার্ত্রে প্রকাশ করেন এইভাবে, “মাছি (লে মুশ) নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে, অরেস্টিস হত্যাযজ্ঞকে এক বিদ্রোহী দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্তরূপে তিনি স্থাপন করেন, যে দায়িত্ব গ্রহণ সমাজকে আত্মানুশোচনা থেকে মুক্ত করে এবং তার মেনে নেওয়ার অভ্যাসকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। সে সাথে তিনি এও দেখান যে, মানুষ ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তার কাজের সব পরিণাম স্বীকার করে নিতে যত প্রস্তুত থাকে তত তা প্রত্যয়যোগ্য হয়।”[১৩৫] অনুরূপভাবে এদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অরিস্টিসের মতো অত্যাচারী ও শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশের ও ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। এজন্য তাকেও অস্তিত্বশীল স্বাধীন মানুষ বলা যায়। এভাবে মানবজীবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীনতা যথার্থ কাজে ব্যবহার করে এবং

---

133 Franz Kafka, *Parables and Paradoxes, in German and English*, New York, Schocken Paperbacks, 1961, p. 299.

134 Ronald Grimsley, op. cit., 1955, p. 57.

135 রবিন ঘোষ (সম্পাদিত), ewIK msL¨v 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

একইসাথে অচেতন পদার্থ (আঁ-সোঁয়া) থেকে ব্যক্তি নিজেকে আলাদা করে যথার্থ অস্তিত্ব (Authentic Being) সৃষ্টি করবে বলে সার্ত্রে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

ZZxq Aa¨vq

3. Rv-cj mv‡Îi A¯ÍZev‡'i mv‡_ cvmw½K weIqmgn

3.1 A¯ÍZev' I mwnZ¨

জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর গভীর জীবানুভূতিগুলো শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে পেশাগত দর্শন না বলে শিল্পসাহিত্য, নাটক-উপন্যাসের এক যৌথ প্রয়াস হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ দর্শনকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রচনা করেছেন একাধিক গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। যেমন, তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে নাশিয়া (Nausea), দি রুম (The Room), দেওয়াল (The Wall), রোড টু ফ্রিডম (Roads to Freedom); নাটকগুলোর মধ্যে আছে নোংরা হাত (Dirty Hands), মাননীয়া বারবনিতা (The Respectable Prostitute), মাছি (The Flies), অনস্তিত্ব (No Exist), বারিওয়ালা (Barionaor), দি সন অফ থিনডার (The Son of Thender), লুসিফার অ্যান্ড দি লর্ড (Lucifer and the Lord)। তাছাড়া তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ শব্দ (The Words) এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের বাইবেল হিসেবে খ্যাত সত্তা ও শূন্যতা (Being and Nothingness) ও অস্তিত্ববাদ এবং মানবতাবাদ (Existentialism and Humanism) প্রভৃতি গ্রন্থেও তিনি তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন ফুটিয়ে তোলেন। এসব সাহিত্যের মধ্যে যেসব বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে তা হলো ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা, হতাশা, উদ্বেগ, আমি ও অপরের সাথে দ্বন্দ্ব, সত্তার শূন্যতা, যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব প্রভৃতি। এ সাহিত্য চর্চার একটি বড় কারণ, বিগত শতকে সংঘটিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে দুটি মহাযুদ্ধ, বামপন্থি শিবিরে ভাঙন, নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনীতিতে অস্থিরতা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা-প্রাচুর্যে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি এবং সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। এর ফলে যে মিথ্যাচার, প্রতারণা ও সুবিধাভোগের বুর্জোয়া রাজত্ব তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্তির জন্য সার্ত্রে ঈশ্বরকে নীরব অনুপস্থিত ও নিঃসঙ্গ বলে মানুষের ওপরই সমস্ত ভালোমন্দের মীমাংসার ভার দিয়েছিলেন শুধু তা নয়, মানুষ কীভাবে স্বাধীন হতে হয়, মানুষের যথার্থ অস্তিত্ব কীভাবে প্রকাশ পায়, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম, বাহ্যজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি দর্শনিক গ্রন্থ 'সত্তা ও শূন্যতা' রচনা করেন। নিম্নে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কিত সার্ত্রে রচিত গ্রন্থসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো: সার্ত্রে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে যে অস্তিত্ববাদ দর্শন ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ÔbwkqwÕ (Nausea); যা প্রকশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এ উপন্যাসটি মূল চরিত্র অ্যান্টোয়েন রুখেটিন, তার জীবনের নানা অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা ডাইরি আকারে লিপিবদ্ধ করেছে। এ ত্রিশ বছরের যুবকটি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোনো বন্ধন নেই, কোনো পিছুটান নেই-যেখানে ইচ্ছা করে সেখানে যায়, যা মনে চায় তাই সে করে। মনে হয় সে কত না স্বাধীন । এরূপ স্বাধীন জীবনকে সার্ত্রে স্বেচ্ছাচারী বলেছেন। যে

জীবনে কোনো অঙ্গীকার নেই সে জীবন তিনি উপহাস বলে আখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, অঙ্গীকারবিহীন স্বাধীনতা মূলত স্বাধীনতা থেকে পালানোর সামিল। যা তিনি রোড-টু-ফ্রিডম এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা প্রতিবন্ধক হিসেবে এবং অন্য এক অর্থে অন্য ব্যক্তি নরক হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুখকর নয়। কেননা একমাত্র মানুষই মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হিংসার হতে পারে। তাই তিনি ১৯৬৪ সালে 'প্লেবয় ম্যাগাজিনে' এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> " অন্য ব্যক্তি নরক-এ অর্থে যে অর্থে আপনি জন্ম থেকে এমন একটি অবস্থানের মুখোমুখি যা আপনি গ্রহণ করতে বাধ্য।...আপনি যদি হয়ে থাকেন কৃষকের সন্তান, তাহলে সমাজব্যবস্থা বাধ্য করবে আপনাকে শহরে চলে যেতে, সেখানে আপনি চালাবেন যন্ত্রপাতি, যে যন্ত্রপাতিগুলো চলমান রাখার জন্য প্রয়োজন আপনার মতো একজনকে। পুঁজিবাদের চাপে নিজের গ্রাম থেকে বিতারিত ছেলেটি, আপনি যে শ্রমিক হয়ে গেলেন-এটি আপনার নিয়তি। প্রকৃত অর্থে আপনার সত্তা কী? আপনার সত্তা হলো আপনার কাজ যা আপনি সম্পাদন করেন এবং যা আপনার ওপর এমনভাবে কর্তৃত্ব করে যার ফলে আপনি ক্ষয় হয়ে থাকেন, এবং যা আপনার মজুরি ও আপনার জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে আপনাকে এক বিশেষ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সবকিছু অর্পিত হয় আপনার ওপর অন্যের দ্বারা। এ ধরনের অস্তিত্ব প্রকৃত অর্থে নরক।[১৩৬]

জাঁ-পল্ সাত্রে Ôw' iægÕ নামক ছোট গল্পে ভোগবাদী ও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় চিত্র অঙ্কন করেছেন। যথার্থ অস্তিত্বের অন্যরূপ হচ্ছে মানুষের উন্মাদগ্রস্ততা, তার একটি অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। এখানে 'ইভ' একজন বিবাহিতা মহিলাকে দারেদা নামক ভোগবাদী ও বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তার দ্বিতীয় স্বামী পিয়ের উন্মাদগ্রস্ত হলে তাকে ত্যাগ করে এবং পাগলা গারদে পৌঁছে দিতে বলে। ইভের বাবা-মা দারেদার কথাকে জোরালো সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু ইভ তাদের এ কথাকে বিরোধিতা করে বলে যে, আমার পক্ষে আর স্বাভাবিক জীবনে যাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণ হিসেবে সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ইভ বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন মহিলা নয়। তার মধ্যে মানবিকতা বা মানুষের প্রতি তার সহানুভূতি রয়েছে। সব ব্যক্তি যদি বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন হয় তাহলে সমাজে মানবিকতা বলে কিছু থাকবে না। তাই সে তার স্বামীর পাগলামিটাকে সম্মান প্রদর্শন করে এইভাবে, "... ইভ চোখ বন্ধ করে নেয়। বুকটা উঠানামা করছে। আমি কিছু বলব না। ও যদি রাগ করে, আর কিছু বলবে না, ইভ ভাবতে থাকে। পিয়ের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে, আমি

136 অধ্যাপক ড. নীরুকুমার চাকমা, 'kb I mwnZ¨, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৩, পৃ.২৭।

তোমায় ভালোবাসি আগাথা। কিন্তু আমি তোমায় বুঝতে পারি না। কেন তুমি আমার এ ঘরে সবসময় থাক।"[১৩৭] পিয়ের এ জিজ্ঞাসা উত্তরে ইভ বলে, তুমি জান না তোমায় আমি কত ভালোবাসি। এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভালোবাসা ইভকে একজন অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে এবং সে স্বাধীনচেতা হয়ে বাবা-মাসহ সকলের মতের বিরোধিতা করে। সার্ত্রে বলেন, ইভের স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হওয়ার পর তাকে কোনো কাজের জন্য দায়ী করা যাবে না। তিনি আরোও বলেন, একজন স্বেচ্ছায় নির্বাচন করে সচেতনতার সাথে কোনো কাজ করলে সেকাজের নেতিবাচক ফলাফল হলে তাকে দায়ী করা যায়। এভাবে ইভ একা নিজস্ব সিদ্ধান্ত যথার্থ অস্তিত্বশীল সকল বুর্জোয়া মানুষের সাথে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

জঁা-পল্ সার্ত্রে তাঁর Ô†bvsiv nvZÕ নাটকের মাধ্যমে যে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন তা হলো রাজনীতি পরিচয়ে ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির, সরকারি দলের সাথে বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ কীভাবে হাত নোংরা করে, অপর দলের লোকদের অস্তিত্ব বিনাশ করে এবং ক্ষমতা দখল করে । এসব দৃশ্য দেখে সার্ত্রের মনে হয়েছে, "হাত নোংরা না করে কি ক্ষমতার রাজনীতি করা সম্ভব?"[১৩৮]

বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থিয়েটার ওয়ার্কশপ সার্ত্রের Ôgvbbxqv evieibZvÕ নাটকে আমেরিকার জাতিগত বিদ্বেষ প্রতিফলিত হয়েছে; যাতে তিনি দেখিয়েছিলেন, শত শত মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছিল। এভাবে গত ত্রিশ বছর ধরে আমাদের সামাজিক নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে শোষণ, বিদ্বেষ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ছবি। এখানে বিচ্ছিন্ন মানুষের যে হাসি-কান্না-বিদ্রূপ ও অসহায়তা দেখেছি কিংবা বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। তার পিছনে সমাজবাদী ও অ্যাবসার্ডবাদীদের বিচ্ছিন্নতা বিরোধী সার্ত্রীয় মানবিকতাও অবশ্যই কাজ করেছে। অস্তিত্ববাদী নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ এসেছিল সার্ত্রের নিজস্ব জীবনদর্শন থেকে। তবে সার্ত্রের নিজস্ব জীবনদর্শন ও সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ইউরোপের যুদ্ধ। এ ইউরোপীয় যুদ্ধের বীভৎসতা দেখা যায় বিভিন্ন দেশে। যেমন, যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব হয়, দেশ ভাগ হয়; লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়া হয়; মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা। অর্থাৎ ঠিক বেঁচে থাকার বিপরীত পরিবেশ তৈরি হয় বিভিন্ন দেশে। এ বিপরীত পরিবেশ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং বেঁচে থাকার অর্থহীনতার আবহাওয়ায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সার্ত্রে তাঁর শিল্প জগতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এজন্য সাহিত্যিকদেরকে বলেছিলেন, পরিবেশ সচেতন ও জীবনমুখী হতে যেন কোনো হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা মানুষকে গ্রাস করতে না পারে। কিন্তু স্বাধীনতার পর শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বহীনতায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হলো, তাতে বেঁচে থাকার পরিবেশ আরো অসহ্য হয়ে উঠল।

---

137 গল্পসংগ্রহ, Rv-cj mv‡Î, অনুবাদঃ রতনকুমার দাস, ঢাকা, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ,৩৮।

138 জঁা-পল্ সার্ত্রে, †bvsiv nvZ, ভাষান্তর, শিবনারায়ণ, কলকাতা, সুবর্ণরেখা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ২।

এর ফলে তারুণ্যের বিদ্রোহে শাসন-যন্ত্রের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সূচনা হলো প্রজন্ম-ব্যবধান এবং জেনারেশন-গ্যাপের এক তীব্র ধিক্কারবোধ, যা সমস্ত শিল্পজগতের ঐক্যকে বিসর্জন এবং চরম অর্থহীনতাবোধ আক্রমণ করলো। এখান থেকে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা দেখা দিল যার ফলে সামাজিক জীব হিসেবে আমরা মানুষ একে অপরের সহায়ক না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এ প্রসঙ্গে Juoti Shekhar Mukerjea বলেন, "The fact is our behavior appears to be very selfish. We remain indiffierent, to the suffering and miseries of others. Yet we live in society, This goes counter to the purpose of society. No doubt it defeats the very purpose of society. We have no right to live in society if we do not play our parts in it we should. "[139]

অস্তিত্ববাদের একদিকে মৃত্যু ভয়, অন্যদিকে 'সক্রিয়' জীবনসংগ্রাম কথা লিখতে গিয়ে তিনি Ô†' lqvjÔ (Le Mur), নামক এক ছোটগল্পের প্রবর্তন করেন। এটি সার্ত্রের প্রথম ছোটগল্প যা প্রকশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এ গল্পটি স্পেনের গৃহযুদ্ধ (শুরু ১৮ জুলাই ১৯৩৬ থেকে শেষ ১ এপ্রিল ১৯৩৯ পর্যন্ত) কেন্দ্র করে রচিত। এখানে স্প্যানিস রিপাবলিক্যান ফ্যাসিস্টদের হাতে ধরা পড়ে প্রস্টেট, পাবলো ইবিয়েটা, টম ও জুয়ান। এ চার জনই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ নাটকটির সার্থকতা হলো পাবলো ইবিয়েটার দুই সঙ্গীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর, যখন পাবলো ইবিয়েটাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে তখন তার কাছে প্রস্তাব আসে, সে যদি তার নেতা রোমন গ্রি এর গোপন আস্তানা কোথায়; তা জানিয়ে দেয় তাহলে তাকে সাময়িকভাবে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! পাবলো তার নেতার আত্মগোপনে থাকার আস্তানা নাম আনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলে দেয়। সেই ঠিকানা মোতাবেক রিপাবলিক্যান ফ্যাসিস্টরা তার সন্ধান পায় এবং পাবলো সাময়িকভাবে তার মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পায়। এ গল্পটিতে অস্তিত্ববাদ দর্শনের প্রয়োগটা হচ্ছে, পাবলোকে তারা এমন একটি সংকটাপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দেয়, তার নেতা কোন জায়গা আত্মগোপন করেছে তার অবস্থান বলে দিতে হবে-না হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। এমন অবস্থা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় একজন বন্দি অবস্থায় নিজেকে কীভাবে পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে চলতে হয় এবং এর মনোবিশ্লেষণ এ ছোট গল্পে বর্ণিত রয়েছে এভাবে, "... চারপাশে সবকিছু ভনভন করে ঘুরছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি মাটিতে বসে আছি। আমি হাসছি, কাঁদছি, চিৎকার করছি-খান খান হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।"[১৪০] তিনি বিভিন্ন সময়ে জীবনের বৈচিত্র্যের কথা বলেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে নিজের ইচ্ছামতো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। নানান দুর্জ্ঞেয় শক্তি একটি

---

139 Juoti Shekhar Mukerjea, *Humanism*, D.G. Lawate, Nagpur, 1969, p. 35.

140 গল্পসংগ্রহ, Rv-cj mv‡Î, অনুবাদঃ রতনকুমার দাস, প্রাগুক্ত, পৃ,২৪।

বিশেষ খাতে জীবনকে টেনে নিয়ে চলে, ব্যক্তিকে সে খাতে চলতে বাধ্য করে। যেমন, "এক রাখাল বালক মহাজনের মহিষ নিয়ে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কোথাও সে থামেনি। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর চিৎকার করে বলছিল, আমার পথটা বলে দাও। সেই রাখালের পথ চলা শেষ হয়নি। বোধহয় শেষ বলে কিছু হয়ও না। শুধু লক্ষ্যভূমির দিকে অবিরাম চলার নামই বোধ হয় জীবন। এ জীবনপথের আমিও পথিক আমিও চলেছি 'আমার এ পথ চলাতেই আনন্দ গাইতে গাইতে'।"[১৪১]

সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনে দেখিয়েছেন, কীভাবে বিন্যস্ত জীবনে শুধু টিকে থাকার ছক ভাঙার চেষ্টায় ব্যক্তিমানুষ সক্রিয় হতে চেয়েছে যেমন, '†iwWm U wdWgû এর মাথু এ নিছক অস্তিত্বের সীমাতেই হতাশ হয়েছে। এ হতাশা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে লক্ষ্যকে স্থির করে পরিস্থিতি বিবেচনা করে যথার্থ অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হতে হয়। "Man 'exists' first, then must make an authentic free, choice, in situation, thereby inferring himself by his act. "[142]

সার্ত্রের এ উপন্যাসের মূল চরিত্র মাথু তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলেছে, জীবন পথে চলতে চলতে আমার বিতৃষ্ণা এসেছে, নতুন নতুন রোমাঞ্চ খোঁজার ইচ্ছে চলে গেছে। এই যে নতুন নতুন রোমাঞ্চ খোঁজার ইচ্ছা ব্যক্তিমানুষকে গড়ে তোলে অযথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে এবং রোমাঞ্চের মধ্যে ডুবে থাকায় অযথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তার যথার্থ অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক কর্মপন্থা নির্বাচন। তাই সার্ত্রে বলেছে, আমি খুব ভালোভাবে জেনে গেছি যে, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কখনো কোনো নিজস্ব স্বরূপ বদলাতে পারেনি। নিজস্ব স্বরূপ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সঠিক কর্মপন্থা নির্বাচন, অনুকূল পরিবেশ ও একাকিত্বভাবে উপলব্ধির জন্য নির্জন জায়গা।

মানুষকে স্বাধীন করার জন্য সার্ত্রে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন, যদি কখনো যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহলে আমি রাস্তায় ছুটে গিয়ে বন্দুক হাতে নিব, নাকি নিজেকে রোমাঞ্চের মধ্যে জড়িয়ে জীবন পরিচালনা করব? এ দুইটির প্রশ্নের মধ্যে তাকে একটি গ্রহণ করতে হবে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে; যা দেওয়াল ছোটগল্পেও সার্ত্রে দেখিয়েছেন। এ স্বাধীনতা নামক নির্বাচনধর্মী শক্তি যে মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন ÔG‡iv¯vZmÕ নামক ছোটগল্পে। আর এ গল্পটি দেয়াল নামক ছোটগল্পেরই প্রতিসন্দর্ভ। এখানে তিনি গ্রিক পুরাণের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী তথা নৈরাজ্যবাদী হিরোস্ট্রেটাসকেই পল হিলবার্টের মতো এক স্বেচ্ছাচারী আধুনিক মানুষ হিসেবে তুলে এনেছেন। এখানে পল হিলবার্ট হচ্ছে

---

141 অরুন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), Ges GB mgq, সাহিত্য ত্রৈমাসিক, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ৪০ মহারানী, ইন্দিরা দেবী রোড, চতুর্বিংশ বর্ষ ৭৮তম বর্ষা সংখ্যা ১৪১৪, পৃ. ২৩৭।

142 বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), Rv-cj mv‡Î, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।

একজন মানববিদ্বেষী, যার উদ্দেশ্য হলো অপরাধের মাধ্যমে কুখ্যাত হওয়া ও ভালো মানুষকে অবজ্ঞা করা। ভালো মানুষ সম্পর্কে তার বক্তব্য পাওয়া যায় নিম্নোক্ত চিঠির মাধ্যমে

> মসিয়,
>
> আপনি একজন বিখ্যাত মানুষ কারণ আপনার জিনিস বাজারে চলে। কারণটা কী? কারণ আপনি মানুষকে ভালোবাসেন। আপনার শরীরে মানবতার রক্ত। আপনি কৃতার্থ মানুষের মাঝখানে থাকলে আপনি মহান হয়ে যান, আর যদি দেখেন কেউ আপনার গুণগ্রাহী, তাকে না জেনেই করুণা বিলিয়ে দেন। ওর শরীরটাও ঠিকঠাক, ঠিক যেমনটা যেখানে থাকার কথা ঠিক তেমনটাই সেখানে। প্রত্যেক হাতে পাঁচটা করে আঙুল। উনি যেভাবে টেবিল থেকে চায়ের কাপটা তোলেন সেই ভঙ্গিটা আপনার ভালো লাগে। বাঁদরের মতো চটপট চটপট করে নয়, একটু ধীরে দেখেশুনে, ঠিক বুদ্ধিমান মানুষের মতো। মানুষের চামড়াও আপনার পছন্দ, শিক্ষিত ভঙ্গি পছন্দ, পা ফেলে চলা পছন্দ, আর সেই জ্যোতিময় দৃষ্টি যা জন্তুরা সহ্য করতে পারে না। কথা বলার মার্জিত ঢং, উচ্চারণ। আপনার লেখা বইয়ের পাতার ওপর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আরামদারায় বসে পাঠ করে, আপনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়। কুৎসিত কী, ভালো কী, মন্দ কী, সাহস কী-এসব প্রশ্নের সহজ সমাধান আপনার কাছ থেকেই পায়। ওরা সবাই আপনার সাম্প্রতিকতম বই নিয়ে একটিই কথা বলে দারুণ হয়েছে।[১৪৩]

পল হিলবার্টের মধ্যে ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য না থাকায় সে মানুষকে ভালোবাসতে পারে না। তার রিভলবারে মাত্র ছ'টি গুলিই আছে, তার মধ্যে পাঁচটি গুলি দিয়ে প্রথম যে পাঁচ জনের সাথে দেখা হবে; সেই পাঁচ জনকে মেরে ফেলবে। আর বাকি যে একটি গুলি থাকবে সেই গুলি দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু তার এ অপরাধমূলক মনোবাসনা পূরণ হলো না। হঠাৎ তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো। সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলো না। সার্ত্রে এখানে বলতে চেয়েছেন মানুষ তার স্বভাবের পরিবর্তন করে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যেমন, পানি আস্তে আস্তে পড়ে শক্ত স্থান গর্তে রূপান্তর করা দেখে বাল্মীকি পড়াশুনা অমনোযোগী থেকে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। অনুরূপভাবে মেকী মানুষ খাঁটি মানুষে রূপান্তর হতেন সার্ত্রের স্বাধীনসত্তার চেতনার আলোকে। এ সদর্থক পরিবর্তনই সার্ত্রে তার বিভিন্ন নাটক, উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে দেখিয়েছেন।

ইস্ট ও অনিস্টের সংঘাত নিয়ে রচিত সার্ত্রের '**Lucifer and the Lord**' নামক নাটকটিতে লুথারের সংস্কার আন্দোলন ও জার্মানিতে কৃষকদের বিদ্রোহ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এর প্রধান চরিত্র গোয়েজ মন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় সে মন্দ কাজ করে বেড়ায় কিন্তু একসময় সে প্রতিজ্ঞা করে মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়ে

---

143 গল্পসংগ্রহ, Rv-cj mv‡f, অনুবাদ: রতনকুমার দাস, প্রাগুক্ত,পৃ,৫০।

ভালো কাজ করবে। তাই সে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাঁর সকল সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে। তাঁর এ ধরনের পরিকল্পনা কৃষক আন্দোলনের নেতা নাস্তি বিরোধিতা করে। এর কারণ তার এ সম্পত্তি কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করবে। কিন্তু গোয়েজ মনে করে যে, এ কাজ কৃষকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা করবে। তার ধারণা ভালো কাজই মানুষের মধ্যে সুখ ও ন্যায় সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নাস্তির কথা ঠিক হয়। কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে কৃষকদের বিরত থাকার জন্য গোয়েজ অনুরোধ করে। কিন্তু এতে তারা গোয়েজ বিদ্রূপ করে এবং গালি-গালাজ করে। ফলে তাঁর আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যায়। ঈশ্বরের কাছে এ বিপ্লব নিরসনের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে না। কারণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ করার জন্য ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই গোয়েজের মুখ থেকে নিম্নোক্ত উক্তিগুলো বেরিয়ে আসে,

> আমি স্বর্গে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। উত্তর আসেনি। স্বর্গ আমার নামকেই অগ্রাহ্য করলো। মিনিটের পর মিনিট ঈশ্বরের চোখে আমি কী রকম তা জানতে চেয়েছিলাম। এখন উত্তর জেনেছি: কিছুই না। ঈশ্বর আমাকে দেখে না, ঈশ্বর আমার কথা শুনতে পায় না, ঈশ্বর আমাকে চিনে না। এই যে মাথার ওপর শূন্যতা? এটিই ঈশ্বর। নীরবতাই ঈশ্বর। শুধু অবর্তমানতাই ঈশ্বর। মানুষের একাকিত্বই ঈশ্বর ...আমি একাই মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিই; এবং আমি নিজেই ঈশ্বরকে উদ্ভাবন করি...ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। তিনি অস্তিত্বশীল নন ... আর স্বর্গ নয়, আর নরক নয়, জগৎ ছাড়া আর কিছুই নেই।"[১৪৪]

সার্ত্রে ব্যক্তি মানুষের ইস্ট ও অনিস্টের দিকগুলো উপলব্ধি করার জন্য স্বাধীন চেতনাকে টেনে নিয়েছেন, যে স্বাধীন চেতনা কোনো বিষয়ের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। কেননা চেতনাভিত্তিক কোনো নির্বাচনই ব্যক্তি মানুষকে অনন্যতা ও বিশিষ্টতা প্রদান করতে সহায়তা করে। সার্ত্রের বিভিন্ন নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পে এ ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিমানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ইভ, অরেস্টিক, রুখেটিন, পল হিলবাট, পাবলো ইবিয়েটা ও গোয়েজ প্রমুখ। এসব ব্যক্তিমানুষ নিজস্ব সত্তা (Subjectivity) দ্বারা পরিচালিত হয়। এজন্য তাঁরা অতিবর্তী সত্তা অধিকারী হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী সিগমন ফ্রয়েড বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবচেতন মন আমাদেরকে পরিচালনা করে এবং অহংবোধ আমাদের আইডি ও অতিচেতন অহং এর মধ্যে মধ্যস্থতা করে নির্বাচন করে দেয় কোনটিকে আমরা গ্রহণ করব। সার্ত্রে তাঁর এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা আমাদের নির্বাচন করে দেয় অনেক বিকল্পের মধ্যে কোনটিকে আমর গ্রহণ করব। এ প্রসঙ্গে Jean-Paul Sartre বলেন, "The ego is not the owner of consciousness; it is the object of

---

144 অধ্যাপক ড. নীরুকুমার চাকমা, 'kb I mwnZ¨', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৩, পৃ. ৩৮।

consciousness. To be sure, we constitute spontaneously our states and actions as productions of the ego. "[145] অস্তিত্ববাদ সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ করা যায় যেমন, সৈয়দওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসে। এ 'লালসালু' উপন্যাসে চরিত্রগুলো নেওয়া হয়েছে সার্ত্রে 'মাছি' নাটক থেকে, সেখানে ইজিস্টাস ছিলেন ÔgwQÕ নাটকে এক মেকী চরিত্রের অধিকারী, তিনি স্বাধীন ছিলেন বলে কৃত্রিম উপায়ে গল্প তৈরি প্রজাদের শাসন করতেন। তার এ মেকী চরিত্র উন্মোচিত এবং ইজিস্টাস হত্যা করেন 'মাছি' নাটকের নায়ক অরেস্টিস। অনুরূপভাবে, সৈয়দওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মেকী বা অযথার্থ চরিত্রের অধিকারী মজিদকে পরাভূত করে যথার্থ চরিত্রের অধিকারী জমিলা (মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী)। সার্ত্রের যথার্থ চরিত্রের অধিকারী সম্পর্কে আরও বলেন, নিজের বা বন্ধুগোষ্ঠীর কোনো অথেনটিসিটি প্রমাণ করতে প্রয়োজনে রাষ্ট্রবিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হবে। রাজনীতির মাধ্যমে সহিংসতা করে জেলে যেতে হবে। শুধু ফুর্তি করে, পুরনো স্মৃতি নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। এতে নিজের এবং আপন বন্ধুগোষ্ঠীর যথার্থতা (অথেনটিসিটি) প্রমাণ করা যায় না। অথেনটিসিটি মানবসত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ। যা নজরুল সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মো. এলাম উদ্দিনের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে, "অস্তিত্ববাদী মানবতন্ত্রে মানুষই সত্তার কেন্দ্র ও অর্থ। এ জগতের এক বা অদ্বিতীয় নায়ক। বাইরে পরমসত্তার অধিষ্ঠান যে নেই, এ ধারণা নজরুলের চেতনায়ও প্রকট। তাঁর চেতনার মূল্য উদ্দেশ্য অন্যায়, অসাম্য, নিপীড়ন, শোষণ ও অবিচারে মানুষের বিদ্রোহী সত্তার পূর্ণ উদ্বোধনে মানবতার জয় ঘোষণা করা।"[১৪৬] এসব অমানবিক সিচ্যুয়েশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা সার্ত্রীয় দর্শনে ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে, সমরেশ বসুর 'বিবর' ও 'সংকট' উপন্যাসে, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সংকট' উপন্যাসে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাসে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাট্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' নাটকে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাচের দরজা' উপন্যাসে, সন্তোষকুমার ঘোষের 'জল দাও' উপন্যাসে, বিমল করের 'খড়কটো' উপন্যাসে, জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতায়, জ্যোতিন্দ্র নন্দীর 'প্রেমের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে ও কমল কুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসেও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্বশেষে, সার্ত্রে ব্যক্তিমানুষের সব কর্মকাণ্ডকে অর্থহীন বলে মনে করেছেন এবং অ্যাবসার্ডকে অস্তিত্ববাদী সাহিত্যে টেনে এনেছেন এই ভেবে যে, যাতে ব্যক্তির নিজ সত্তার প্রতি সচেতন হয় এবং ব্যক্তি ভিতরের হতাশা দূর করে যথার্থ (অথেনটিক) অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

---

145 Jean-Paul Satre, *The Transcendence of the Ego,* trans. by Forrest Williams and Robert Kirkpatrick, New York, Noonday Paperbacks, 1957, p. 97.

146 মো. এলামউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৩.২ A¯ÍZev‘ I gvbeZvev‘

পৃথিবীতে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব মানবিক না অমানবিক হবে? ব্যক্তিমানুষ কি শুধু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকবে নাকি একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলবে? এসব প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে সার্ত্রে মানবতাবাদ বিষয়টি আলোকপাত করেন। মানবতাবাদী অস্তিত্ববাদ মানুষকে গড়ে তোলে এক অনন্য মানুষ হিসেবে যার পিছনে কাজ করে মানবতা। মানবতা হচ্ছে ব্যক্তি নিজ সত্তার মধ্যে এমন এক শক্তি জাগ্রত করে, যা সব মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ মানুষের কল্যাণের জন্য যা যা করে তাই হচ্ছে মানবতাবাদ। আর সকল মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং অথেনটিক মানুষ যেভাবে নিজেকে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে অস্তিত্ববাদ। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করা হলো "... When we say that man chooses himself. We do mean that every one of us must choose himself first, but by that we also mean that in choosing for himself he chooses for all men. "[147] মানবতাবাদ কথাটি শুধু একটি নিরেট শব্দ নয়। এটি একটি গুণবাচক শব্দ।

> "মানবতাবাদ সেই বৈশিষ্ট্য কিংবা সেই গুণাবলি যা মানুষের আবেগ-অনুভূতির আস্তরণে আবৃত-পরোপচিকীর্ষা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। অর্থাৎ চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধে অবিচলতা, সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারে অবসানে আন্তরিক প্রয়াস, সর্বোপরি বিশ্বজনীন মানব সভ্যতার বিশ্বাস ও আস্থা। আবার স্নেহ-ভালোবাসা, সৌজন্য-সহৃদয়তা, কৃপা-করুণা, দান-দাক্ষিণ্য, প্রতিবেশীর দুঃখ-যন্ত্রণা এবং রোগে-শোকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, দুস্থ-রুগ্নের সেবায় আগ্রহ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংযম-নির্লোভতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্যে আস্থা, মৌল মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি গুণাবলি মানবতার নির্দেশক।"[১৪৮]

মানবতাবাদ এক জীবন্ত স্লোগান। মানব সভ্যতা যতদিন থাকবে মানুষের মর্যাদাবোধ ততদিন বেঁচে থাকবে মানবতাবাদীদের অন্তরে। কিন্তু জাঁ-পল্ সার্ত্রের ভাষায় মানবতাবাদের উৎপত্তি 'সাবজেকটিভিজম্ বা আধ্যাত্মিকতা থেকে যার অর্থ দু'রকম। একদিকে নিজের মুক্তি, আত্মচৈতন্য লাভ; আর অন্যদিক হলো নিজেকে অর্থপূর্ণ করে ব্যক্তিজগৎকেও অর্থপূর্ণ করা। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিই তার কর্মের দ্বারা যুক্তিযুক্ত হয়। এ দ্বিতীয় ঘটনাই অস্তিত্ববাদী দর্শনের গভীরতর তাৎপর্য। কারণ এখানে এসেই অস্তিত্ববাদী দর্শন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে মানবতাবাদের সাথে।

---

147 মো: এলামউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

148 পারভীন আক্তার, gvbe Dbq‡b gvbeZvev‘, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৩: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃ. ১৭৯|

এই প্রসঙ্গে জঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "মানুষ কী হয়ে উঠবে তা সে নিজেই নির্বাচন করতে বাধ্য। তখন সে উক্তির মধ্যে এ উদ্দেশ্য থাকে যে, সে যখন নিজের জন্য কিছু নির্বাচন করবে তখন সাথে সাথে সে তা সব মানুষের হয়েই করে। কারণ তার হয়ে ওঠার মধ্যে থেকে সব মানুষের হয়ে ওঠার একটি সর্বজনীন আদলও গড়ে ওঠে। অন্য রকম করে বলা যায়, কেউ যখন কিছু হয়ে ওঠে তখন অন্য সবাই, সব মানুষই জানতে পারে অনুরূপ হয়ে ওঠার সামর্থ্য বা প্রবণতা তাঁর মধ্যেও নিহিত আছে–চেষ্টা করলে সেও তেমনটি হলেও হতে পারে।"[১৪৯] মানুষ হয়ে ওঠার ব্যাপারে সব সময় ভালো কিছু হয়ে ওঠারই সংকল্প করে। খারাপ কিছু সে কিছুতে সংকল্প করতে পারে না। তার হেতু এই যে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা বা অস্তিত্ব আগে তারপর সারসত্তা। তাই আমরা হয়ে উঠি এ কথাটার তাৎপর্য দাঁড়ায় আমরা আমাদের মধ্যে সারসত্তা তৈরি করে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে একটি যুগের সমগ্র মানুষের হয়ে ওঠার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হই। কিন্তু আমরা প্রকৃতির নিয়ম না বুঝে যুক্তিহীনভাবে কোনো অপরাধ করে বসলে এর দায় নিজেকে বহন করতে হয় এবং আমাদের এ কর্মকাণ্ড সবাইকেই স্পর্শ করে বিধায় সমগ্র মানুষের হয়ে ওঠার ইতিবাচক প্রতীক না হয়ে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠি। তাই কর্মফল তৈরি পিছনে যে সত্তাটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে তা হলো ব্যক্তির ফল লাভস্বরূপ যুক্তি এবং তা অর্জনে অবিচল থাকা। এ প্রসঙ্গে Frederick J. E. Woodbridge and Wendell T. Bush, "...If determinism is true there are events which occur before a person comes into existence which, in conjunction with the law of nature, logically entail everything he does. But events occurring before one comes into existence are beyond one's control, and likewise are the laws of nature."[150] এ অবিচল থাকার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আবেগ ব্যক্তিকে সবার দায় নিতে বাধ্য করে। তারপর সবার দায় আমার দায় হয়ে ওঠে। আমরা এভাবে এক খণ্ড দায়িত্বে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে যাই। সুতরাং আমরা যতখানি অনুমান করি আমাদের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। যেহেতু আমাদের কাজ গোটা মানবজাতিকেই প্রভাবিত করে সেহেতু গোটা মানবজাতির সাধারণ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন, সার্ত্রে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, ধরুন, আমি একজন শ্রমিক। আমি কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নে যোগ না দিয়েই যোগ দিলাম ক্রিশ্চিয়ান ট্রেড ইউনিয়নে। ঐ সংস্থায় যোগ দেওয়ার মানে যদি এ হয় যে, মানুষ নামের যোগ্য হওয়ার জন্য খ্রিস্টীয় শরণাগতই যথেষ্ট তাহলে ব্যক্তি নিজের তৈরি না করে বিভিন্ন সংস্থা ও ইউনিয়নে যোগ দিয়ে মানুষ হতো। অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মানুষের স্বর্গ এ পৃথিবীতে নয়, স্বর্গ পরলোকে, তা এ সিদ্ধান্ত আমি কেবল আমার জন্য নয়; বরং সকল মানুষের জন্য। কেননা আমি মনে করেছি, ওটাই আমার পক্ষে আদর্শ সিদ্ধান্ত।

---

149 জাঁ-পল্ সার্ত্রের, A¯ÍZev‘ I gvbeZvev‘, ভাষান্তর, মৃণালকান্তি ভদ্র, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৩৯।

150 Frederick J. E. Woodbridge and Wendell T. Bush, *The Evolution of Human Altruism, The Journal of philosophy*, inc. Volume XC, Number 1, January 1993, p. 517.

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ, আমরা যদি এক বিবাহপ্রথায় বিশ্বাসী হই এবং কোনো ক্রমেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ পরিগ্রহণ না করি আমাদের সে সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের জন্যই আমরা এক পত্নীত্ব প্রথার উৎকর্ষতাকে আদর্শ বলে মেনে নেই। একেই সার্ত্রে বলেছেন, "নিজেকে একটি বিশেষ রূপ দিতে চেয়ে আমি সকল মানুষকেই সে বিশেষ রূপ দিতে চাই। এইভাবে আমি নিজের জন্য এবং সকল মানুষের জন্য দায়ী এবং আমি মানুষকে যেরকম চাইছি, মানুষের সেরকম একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলছি। নিজেকে গড়ে তুলতে আমি মানুষকে গড়ে তুলছি।"[১৫১]

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রত্যেক মানুষই চেতনার মধ্যে সজাগ যে, সে কি করছে তার দিকে জগৎ সংসার তাকিয়ে আছে। এ ভাব মনের মধ্যে থাকলে সন্দেহ নেই, তাঁর আচরণ স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হবে, নিয়ন্ত্রিত হবে এই ভেবেও যে, আমার আচরণ দ্বারা অপর ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে আমার মতো আচরণ করে থাকে। এ জন্য বলা হয় একের আচরণ সবাইকেই প্রভাবিত করে। তাই ব্যক্তি নিজের উৎকণ্ঠাকে গোপন করতে, নিজেকে প্রকাশ করতে এবং কাজের দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। এ ভয় ব্যক্তিকে যৌক্তিক ও সঠিক আচরণ করার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে থাকে। সার্ত্রে তাঁর মানবতাবাদে প্রথমত ব্যক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন,"ব্যক্তির সংবিদ বা চেতনা সৃষ্টিশীল। ব্যক্তির সংবিদ যা সৃষ্টি করে সামজিক সংবিদ তা ধারণ করে ব্যক্তি কর্তৃক নতুনের সৃষ্টি হয়, সমাজ সে নতুনকে পরবর্তী বিকাশের জন্য সংরক্ষিত করে। ফলত মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সমাজে নতুন চারিত্রিক গুণ আবির্ভূত হয়।"[১৫২]

এ মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব আমাদের কাজের প্রেরণা। এটি কিংবা ওটি নির্বাচন করা একই সাথে যা নির্বাচন করা হয়, তার মূল্যকে ঘোষণা করা; কারণ আমরা যা খারাপ তা নির্বাচন করতে অসমর্থ। আমরা যা নির্বাচন করব তা আরো ভালোর জন্য এবং আমাদের পক্ষে কিছুই অধিকতর ভালো হতে পারে না, যদি তা সবার জন্য সেরকম ভালো না হয়। তাছাড়া, অস্তিত্ব যদি সারধর্মের পূর্বে হয় এবং আমরা নিজেদের যে ইমেজে গড়ে তুলি সেরকম অস্তিত্ব লাভ করতে চাই, সে ভাবমূর্তি সবার পক্ষে এবং যে যুগে আমরা নিজেদের দেখতে পাই, সে সমগ্র যুগের পক্ষে যথার্থ। আমাদের দায়িত্ব আমরা যা ভেবেছি, তার থেকে অনেক বড় কারণ তার সাথে সমগ্র মানবজাতির সম্পর্ক আছে। যেমন, আমি বিবাহ করতে এবং সন্তানাদি লাভ করতে চাই। যদিও এ সিদ্ধান্তটির মূলে রয়েছে কেবলমাত্র আমার আবেগ অথবা আমার আকাঙ্ক্ষা, তবু তার দ্বারা আমি শুধু নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করছি না, আমি সমগ্র মানবজাতিকে এক বিবাহ নিয়মে আবদ্ধ করতে চাইছি। অন্যদিকে, অস্তিত্ববাদীদের ভাষায়, আমরা যে পরিত্যক্ত। আমরা পরিত্যক্ত ঠিকই। কিন্তু সার্ত্রে বলেন, এ পরিত্যক্ত অবস্থা বলতে আমরা কেবল বুঝি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। এ নেতিবাচক অবস্থার পরিণতির বিচারও অস্তিত্ববাদ দর্শনের আর এক দিক। একদল ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক উনিশ শতকের আশির দশকে নীতিসূত্র সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন

151 জাঁ-পল্ সার্ত্রের, A¯ÍZev' I gvbeZvev', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

152 যজ্ঞেশ্বর রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

এবং বলেছিলেন, ঈশ্বর ধারণা অনুমান মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই আমরা চলব, আমরা গড়ব একটি নৈতিক নীতি-নির্ভর সমাজ তথা আইনানুগ বিশ্ব যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিচারের মানদণ্ড সততা এবং বাধ্য করা হবে মিথ্যা কথা না বলা, প্রবঞ্চনা না করা, স্ত্রীকে মারধর না করা, সন্তানকে সস্নেহে মানুষ করা-ইত্যাকার সব। অর্থাৎ ঈশ্বর থাকবে না বটে কিন্তু তাঁর স্বর্গরাজ্য থাকবে এবং এভাবে এক সময় ঈশ্বর ব্যাপারটা অবহেলায় আস্তে আস্তে মানুষের মন থেকে মুছে যাবে এবং ব্যক্তি সৃষ্টি করবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পৃথিবী যা কামনা করেছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল এভাবে,

> ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়েই দুটি বিপরীত ধরনের কর্মোদ্দীপক লাভ করে থাকে-প্রথমটি হলো সহযোগিতা, অন্যটি প্রতিযোগিতা। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের প্রতিটি অগ্রগতি সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রটিকে আরো প্রসারিত করে তোলে এবং প্রতিযোগিতা আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে দেয়। এর ফলে কর্মোদ্দীপক হিসেবেও প্রতিযোগিতার আর কোনো স্থান থাকবে না, তা আমি বলতে চাইছি না। আমি বলতে চাইছি প্রতিযোগিতা যেন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠার রূপ পরিগ্রহ না করে, বিশেষত, প্রতিযোগিতা যেন কিছুতেই যুদ্ধের রূপ না নেয়। শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা, সম্ভাবনাময় দিকগুলো সম্বন্ধে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তোলা এবং সামগ্রিকভাবে মানবজাতির স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত চিন্তার অভ্যাস গড়ে তোলা।[১৫৩]

তাই তরুণ সমাজের মধ্যে নিজেকে সর্বপ্রথম জয় করার জন্য চেতনার উদয় করতে হবে। কেননা নিজেকে জয় করা বিশ্বকে জয় করার চেয়েও উত্তম। দেকার্তের এ উক্তির মূলে সার্ত্রের মানবতাবাদের বীজ লুকিয়ে আছে। কেননা নিজেকে আগে যথার্থ মানুষ হিসেবে নির্মাণ করে তারপর সব মানুষকে নির্মাণ করবে। তাছাড়া, হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সাথে নিজে জিজ্ঞাসাকারে কথা বলতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সঠিক উত্তরটি বের হয়ে না আসে। যেমন, মানুষের 'মৃত্যু' হচ্ছে পার্থিব জীবনের সকল কাজের সমাপ্তি। এতে তোমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই, তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার, তোমার অসমাপ্ত কাজ আর একজন করবে। তার মানে, অন্যরা অন্যত্র সৃজনশীল যেসব কাজ করছে তার ওপরে আস্থা রাখ তবেই হতাশা থেকে মুক্তি পাবে। এক কথায়, হতাশা ও উদ্বেগ থেকে নিজস্ব সত্তাকে উদ্ধার করতে না পারলে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। আর নিজের অস্তিত্ব সৃষ্টি না হলে ব্যক্তিমানুষের পক্ষে কোনো কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা বাদ দিয়েও কোনো সুস্থ জীবনবোধ, মানবতাবাদী সমাজ তৈরি হতে পারে না। ব্যক্তিমানুষ যুক্তির মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে তখনই তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা অস্তিত্বের সম্ভাবনায় সৃষ্টি হবে। একেই বলা হয় মানুষের মর্যাদা।

---

153 বার্ট্রান্ড রাসেল, gvb‡li wK †Kvb fwel¨r Av‡Q? অনু. শামীম আহমদ, ঢাকা, শব্দগুচ্ছ প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ১০৪।

এ প্রসঙ্গে Paul Roubiczek বলেন, "…The word 'spirit' has all but lost its meaning, and the human mind itself has been impoverished. For, though we may discuss endlessly what is the real difference between animals and man, there is no doubt that man is the only animal which is influenced by its idea of itself, so that the lowering of the status of reason has lowered the status of man and undermined the foundations of his dignity."[154] এজন্য অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষ আস্থা রাখতে পারে, কেবল তাদের ওপরেই যারা নিজেদের সৃষ্টি করে অন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এবং যাদের আমি জানি বুঝি ও কমবেশি যাদের ওপরে আমার একটা ভালো প্রভাব আছে। আমার মতো পথ ও সংগ্রামের পদ্ধতির সাথে আমার সংকল্প ও কল্পনার সাথে যাদের মিল আছে মোটামুটি তাদের ওপরেই আমি নির্ভর করতে পারি, অনুমান করতে পারি তারা আমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে। কিন্তু যাদের ওপরে আমার প্রভাব নেই, যাদের আমি জানি না তাদের ওপরে আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না। এজন্য পারি না যে, এমন কোনো স্থির চিরন্তন অথবা মৌলিক নীতিসূত্র নেই যা সবাইকে এক-মন, এক-চিন্তা, এক-কাজে উৎসাহ দিতে পারে। একদা রুশ বিপ্লব যারা করছে তারা ভবিষ্যতে যেকোনো বিপ্লবের প্রথম সারিতে থাকবে। আজ চীন যা ভাবছে বা করছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেই ভবিষ্যৎ সে যে তাই করবে এমন কোনো স্থির নিশ্চয়তা নেই। কেননা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আগে থেকে নির্দিষ্ট কোনো নীতি নেই। আগামীকাল আমার মুত্যুর পরে আমার দেশ ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠার দিকে যাবে নাকি সমাজতন্ত্রের দিকে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, কারণ পরিস্থিতির প্রভাবে তারা অনায়াসে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এসব কথা ভেবে আমি কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব নাকি নিজেকে কর্মবিমুখ করে রাখব? না, প্রথমে চিন্তাভাবনা করে সবদিকে লক্ষ রেখে একটি সিদ্ধান্তই নেব তারপর ফলের আশা না করেই নির্দিষ্ট কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে নিযুক্ত করব। তখন আমি কোনো দলের সদস্য থাকব না, কিংবা দলের প্রতি কোনো মোহ রাখব না, কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায় কাউকেও ভাগাব না। আমার কাজ সমাজের অবয়ব পাল্টে দেবে কি না আমি জানিনে, কেবল আমি জানব, আমার শক্তিতে যতটা কুলায় আমি সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমার সামর্থ্যের বাইরে তারপর কী ঘটবে আমি জানিনে, তার জন্য ভেবে আমি দুশ্চিন্তা করব না। তাই অস্তিত্ববাদীরা বলেন, "অস্তিত্ব এর প্রান্তিক সম্ভাবনা যে চরম আত্মত্যাগেরই নামান্তর, ব্যক্তিসত্তা তা বুঝতে শেখে। ভবিষ্যতের দিকে ধাবমনা চিন্তা বিষয়টি এড়িয়ে যায় না; বরং ব্যক্তিসত্তাকে তা গ্রহণ করে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়।"[১৫৫] এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি সম্ভাবনা তার কাজের প্রতি আত্মত্যাগের ফলে তৈরি হয়। আর যে ব্যক্তি অর্থপূর্ণ কাজ করতে

---

154 Paul Roubiczek, op. cit., p. 23.

155 অধ্যাপক নূরনবী, c‡qvMev‘ I gvbeZvev‘ Ges Aw¯Í Zev‘ I hw³h³ ‘óev‘, ঢাকা, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৮০।

চায় না, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সে মানবতাবাদী হতে পারে না। কেননা যারা আলস্যে ভোগে তারাই শুধু বলবে, আমি পারি না, তাই করি না, যে পারে সে করুক। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দর্শন এর বিপরীত কথাই বলবে, একাগ্রচিত্তে কাজের দ্বারা ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব তৈরি করে। সে যতটুকু কাজ করে ততটুকু অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা ব্যক্তি নিজের ও অপরের সেবা করতে পারে। অর্থাৎ অস্তিত্ব তৈরি তার ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রমাণ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কী? এর উত্তর প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদীরা বলতে চান যে, মানুষ হচ্ছে সারা জীবনের কাজের ও অভিজ্ঞতার যোগফল। এভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শন মানুষকে কাজে উৎসাহ প্রদান করেন। এখানে আত্মপ্রবঞ্চনার স্থান নেই। কেননা এ দর্শন নিজস্ব পছন্দ বা রুচি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল ব্যক্তির প্রবণতা সর্বদা প্রয়োজনীয় কাজের সাথে সম্পর্ক রাখে। এজন্য জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "I am a being who is originally a project, that is to say, who defines by his end; in being separation from myself which falls into the past and from the world to which I am present, I am transcendence towards a form of being with which I can be identified although as transcendence I can never be identified with any form of being. "[156] ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণ করাই অস্তিত্ববাদী দর্শনে মৌলিক কাজ। এ দর্শন বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তিমানুষ পৃথিবীর ভোগবিলাস ও আরামআয়েশ পরিত্যাগ করে এবং অতীতে সকল প্রকার হতাশাকে নির্মূল করে; শুধু বর্তমানের সময় কাজ লাগিয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করে নিজেই নিজের পরিচয় প্রদান করে বলে আমি কে, আমার লক্ষ্য কী, আমার স্বর্গ কোথায়, কোথায় আমার সত্তা কাজ করতে আনন্দ বোধ করে, এসব নির্ধারণ করে এ দর্শন ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করে। আর এসব সৃজনশীল কর্ম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি নিজস্ব অস্তিত্বে জীবন গঠন করতে পারে না বিধায় নিজের পরিচয় দিতে পারে না এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে না। তারা সবসময় কাজ না করার সুযোগ খোঁজে। তাদের মুখে কেবল শুনা যায়, (ক) আমার ক্ষমতা ছিল কেবল সুযোগের অভাবে প্রমাণ করতে পারলাম না। (খ) আমার যে কোনো মহৎ বন্ধু নেই তার কারণ তেমন মানুষের সাথে আমার দেখা হয়নি। (গ) আমার বিবাহিত জীবন যে সুখের নয় তার হেতু সুখী হতে পারতাম এমন একটি নারী আমার ভাগ্যে জোটেনি (ঘ) আমিও একখানা মূল্যবান বই লিখতে পারতাম কিন্তু ছাপাব কোথায়? ছাপাবে কে? তাছাড়া সময়ই বা পেলাম কোথায় লেখার। অর্থাৎ আমার গুণের ঘাটতি নেই কেবল সুযোগের অভাবে কিছু হলো না। এ অজুহাত দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে অযথার্থ অস্তিত্বশীল হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে। তাছাড়া এসব বুদ্ধি অক্ষমতার, আলস্যের ও উদ্যমের অভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো মানবজীবনে অস্তিত্ব সংকটের জন্য দায়ী। প্রকৃত মানুষ কখনোই এমন খোড়া যুক্তির

---

156 Jean-Paul Sartre. *Six Existentialist Thinkers,* H. J Blackham, London, Routledge and Kegan Paul, 1952, p.129.

আড়ালে আশ্রয় নেবে না। কেননা সে জানে, প্রকাশ নেই এমন কোনো ভালোবাসা নেই। শিল্পকর্মে প্রকাশ পায়নি এমন কোনো প্রতিভাও নেই। যেমন, সার্ত্রের প্রতিভা ছিল তাঁর সমগ্র রচনা তার প্রমাণ। কোনো কিছু প্রকাশ না পেলে তা নেই বলেই প্রকাশ পায় না। আগুন থাকলে তা পুড়বেই। না পুড়লে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অনুরূপভাবে, মানুষের ভিতরে প্রতিভা থাকলে তা এক সময় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। ব্যর্থ মানুষের কাছে এ সত্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক, কেননা সত্য হচ্ছে এমন যা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। মনে মনে সবাই কবিতা লেখে কিন্তু সে কাগজে-কলমে লেখে সেই তো কবি। মনে মনে সবাই গান গায় কিন্তু যে কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করে সেই গায়ক। মনে মনে সবাই গল্প বানায়, যে লেখে সে কথাশিল্পী। এসব কিছু তৈরির পিছনে যে কাজ করে, সে হয় সংবেদনশীল স্বাধীন সত্তা। এ প্রসঙ্গে Antonio Rosmini -র একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "...As the proximate cause of our sensations their essence consists in a certain energy acting upon us, relative to which we are passive. And any activity, different from our own, constitutes a different existence…"[157] অস্তিত্ববাদ দর্শনে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতার সৃষ্টি করতে হলে মানসিক শক্তি অপরিহার্য। যেমন, একজন সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং সাংবাদিক হয় কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার দ্বারা যখন সাহিত্যের বইগুলো এবং সাংবাদিক হওয়ার জন্য অনবরত সংবাদপত্র অনুশীলন করে তখনই তার পক্ষে সাংবাদিক অথবা সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যত বেশি কাজ করবে তত সে বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য ব্যক্তিমানুষ জীবন হচ্ছে সমস্ত কাজগুলোর যোগফল। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো সহজ করে বুঝানো যেতে পারে। ভীরুর উদাহরণই নেওয়া যাক, ভীরুতা কোনো দৈহিক অক্ষমতা নয় তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড, কিংবা দুর্বল মস্তিষ্ককোষ তার ভীরু হওয়ার কারণ নয়। সে নিজেকে ভীরু বানিয়েছে বলেই সে ভীরু। সে এমন সব কাজ করেছে যাতে করে সে ভীরু বলে চিহ্নিত হয়। একজন মানুষ ভীরু না সাহসী, তা তার কাজ দিয়েই প্রমাণ করে, একথা শুনলে সাধারণত মানুষ বিব্রত বোধ করে। তারা স্বস্তি পায় যদি বলা হয়-ঐ লোকটা জন্মেছেই ভীরু হয়ে, এ মানুষটি জন্মেছেই নেতা হয়ে। জন্মলগ্নের গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবই সব, একথা বললে সাধারণ মানুষের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। কেননা তখন তার ভীরু হওয়ায় বা অপদার্থ হওয়ার দায় তার কাজের ওপরে বর্তায় না। বর্তায় তার নিয়তির ওপরে–যে নিয়তি আগে থেকে তাকে ভীরু বা অপদার্থ করে সৃষ্টি করেছে। অতএব এসব নিয়তিনির্ভর লোকেরা অস্তিত্ববাদী দর্শনকে অগ্রাহ্য করে।

---

157 Antonio Rosmini, *The Origin of Thought*, Durham, Rosmini House, 1876, p.135.

অস্তিত্ববাদী দর্শন বলে, ভীরু বা অপদার্থ; কেউ কাউকে ভীরু করে না, নিয়তিও নয়; সে নিজে নিজে হয়। যেমন, আমি যদি জানি ফ্যাসিবাদ মানবতাবিরোধী, গণতন্ত্রের শত্রু এবং জেনেও যদি তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে না দাঁড়াই, তাহলে ব্যক্তিমানুষ মানবতাবাদী হবে কীভাবে? কেবল তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অত্যাচারের ভয়ে, অথবা তাদের ঘুষ বা উৎকোচ বশে ফ্যাসিবাদীদের হয়ে কথা বলতে থাকি তবে আমার এ কাজের বিচারের দ্বারা কী প্রমাণিত হবে–ভীরু না আদর্শ পুরুষ? আজকের জননেতা অবিসংবাদিত আদর্শ পুরুষ বলে অনায়াসে ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তখনও কি সে নেতাই থাকবে সে, নাকি অন্য কিছু বলে চিহ্নিত হবে সে মানুষের কাছে? তার এ চেহারা পাল্টানো জন্মদোষে বা নিয়তির কারণে হয়েছে নাকি কর্মদোষে বা স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে? যদি বলি এটা তার স্বাধীন নির্বাচন বা কর্মদোষে হয়েছে তাহলে তার কাজের দায় তাকে বহন করতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাবতে হবে আমার কাজ অপরের জীবনে কী পরিণাম নিয়ে আসতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাহলে প্রত্যেক মানুষ মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অস্তিত্ববাদী দর্শনের এ দাবিই সব দর্শন থেকে আলাদা করেছে। এ দর্শন মানুষের সামনে যেমন সম্ভাবনার সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে তেমনি চাপিয়ে দিয়েছে মানুষের ওপরে তার কৃতকর্মের দায়িত্ব, এনে দিয়েছে পরিবেশ সচেতনতা। আর সচেতনতা সৃষ্টি হয় কোনো বিষয়কে মানুষ যখন যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে। এ প্রসঙ্গে Alean Garnban Jane Oakbill বলেন, "...For reasons that are largely historical, problem solving and reason have been treated as distinct research topics. Part of the explanation is that behaviourists, though they eschewed many aspects of the study of thinking, were for the most part happy to study the processes of trial and error that, according to thorndike, enabled cats to escape from puzzle boxes. "[158] আমি যুক্তি দিয়ে অনেক অহেতুক চিন্তাকে পরিত্যাগ করে আমার আচরণকে যেমন বুঝতে পেরেছি, আজ আমার এ স্বাভাবিক আচরণ বা যুক্তিশীল আচরণ ভীরু বলে পরিচিত হলেও আগামীকাল আমার মানবতাবাদী বা কল্যাণকামী হয়ে সব মানুষের কাজে নিয়োজিত হব। এ কল্যাণকামী মানুষ হওয়ার দরজা পুরোটাই খোলা আছে, তেমনি আমি বুঝতে পেরেছি আমার যৌক্তিক কাজই আমার পরিচয়। তবে মানুষের মন কোনো ক্ষোভ ও স্থূল সুখের বশবর্তী হয়ে বেপরোয়াভাবে কিছু করতে চায়, এতে যুক্তি নামক সূক্ষ্ম চেতনা যদি বাধা প্রদান করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে রক্ষা করা যায় তাহলে ব্যক্তির সূক্ষ্ম চেতনার ওপর আস্থা আছে বলে প্রমাণিত হয়। নিজেকে স্বাধীন চেতনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলেই অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং অপরের সহানুভূতিও পাওয়া যায়। তাই যুক্তিসম্মত দায়িত্বই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমি একজন

---

158 Alan Garnbam Jane Oakbill, *Thinking and Reasoning,* USA, Blackwell Publishers Ltd. 2001, p. 201.

মানবতাবাদী মানুষ। এ বোধ থেকেই এসেছে কর্মের নীতিসূত্র ও নিজের ওপরে আরোপিত দায়িত্ব। এ সূত্র থেকেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাথে পার্থক্য ঘটেছে সনাতন দর্শনের। সনাতন দর্শন ভিত্তিহীন কতকগুলো আশাবাদের ওপর দাঁড় করানো তত্ত্বের সমষ্টি। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ তত্ত্বগুলো আসেনি, জীবনের ওপরে, ওপর থেকে এ তত্ত্বগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ তত্ত্বগুলো দিয়ে জীবনকে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে অথচ এগুলোর কোনো বাস্তব বা প্রকৃত ভিত্তি নেই। আমরা তাই এগুলোকে বাতিল করে এসে দাঁড়িয়েছি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সত্যের ওপরে, সত্যটি হচ্ছে, 'আমি অস্তিত্বশীল, অতএব আমি আছি'। এটিই চৈতন্যের স্বতন্ত্রবোধ, কেননা এটি স্বতঃই গিয়ে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। এজন্য Paul Roubiczek উল্লেখ করেন, "…The world in which we live and exist. It is not restricted to certain special events within this world, like acts will; for as history shows, man is free to choose different styles of life and different global meanings. Hence, while freedom cannot be clearly focused as a scientific fact. "[159]

'আমি'র স্বাধীন চেতনার সাথে যুক্ত না হলে সব সম্ভাবনা শেষ বিচারে মিথ্যে হয়ে যেতে বাধ্য, তার হেতু আর কিছুই নয়, আসলে এগুলো পরমসত্য নয়, পরমসত্য তবে কি, যা সরল, সহজলভ্য ও সব মানুষের আয়ত্তের মধ্যে-তাই পরম সত্য এবং তার স্থান ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে, যার প্রকাশ ঘটে তার চিন্তায়, চেষ্টায়, আচরণে। দ্বিতীয়ত এ আত্মগত চিন্তার নিয়মের ব্যাখ্যার মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তির মর্যাদার সন্তোষজনক সমর্থন। আসলে এটিই একমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, যা মানুষকে বস্তুতে রূপান্তরিত করে না; সব রকম বস্তুবাদ মানুষকে বস্তুতে পরিণত করে। চেয়ার, টেবিল, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি বস্তুকে যেমন কতকগুলো পূর্বনির্দিষ্ট স্থির ধারণা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, কতকগুলো স্থির গুণ দিয়ে বিচার করা হয় সেভাবে বস্তুবাদ মানুষকেও পূর্বনির্দিষ্ট কতকগুলো আদর্শ বা নিদর্শনের মধ্যে ছাঁচের মতন ফেলে। কিন্তু আমরা কি কোনো মতবাদের ছাঁচে গড়া মানুষ? কারণ মানুষ যদি বস্তুর মতো ছাঁচে গড়া হতো তাহলে হয়তো মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে পরিবর্তন করতে পারত না। অস্তিত্ববাদী দর্শনের লক্ষ্য হলো একটি মানুষের জগৎ তৈরি করা। এ জগৎ তৈরির কাজে ব্যক্তিচিন্তাই সবটুকু নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার সমন্বয়ও রয়েছে এর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে Jean-Paul Sartre বলেন, "…Man first of all exists, encounters himself, surges up in the world-and defines himself afterwards. If man as the existentialist sees him is not definable, it is because to begin with he is nothing. "[160] এ ধরনের উক্তি সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন মানবতাবাদী দর্শনে পরিণত করেছে।

---

159 Paul Roubiczek, op. cit., p. 6.

160 Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism,* Trans. Philip Mairit, London, Methuen & Co. Ltd, 1948, p. 28.

যদিও অস্তিত্ববাদী দর্শন বলতে বুঝায় প্রতি 'ব্যক্তি' এর অস্তিত্বের স্বগত (অন্তর্গত) অভিজ্ঞতাজাত দর্শন। এ ধরনের দর্শন তৈরি হয় ব্যক্তির নিজ সত্তার নির্বাচন থেকে যা সবার কল্যাণের সাথে জড়িত। স্বাধীন ব্যক্তিই সবার কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে। এজন্য ব্যক্তিসত্তা কখনো স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সার্ত্রে বলেন, "The word 'Subjectivism' is to understood in two senses, and adversaries play upon only one of them. 'Subjectivism' means, on the one hand, the freedom of the individual subject and, on the other, that man cannot pass beyond human subjectivity, It is the latter which is the deeper meaning of existentialism. "[১৬১]

এ ব্যক্তিসত্তা 'আমি চিন্তা করি' এ ধরনের সূত্রটি থেকে আবির্ভূত হলেও তবে দেকার্ত ও কান্টের মতো নয়; বরং ঠিক তাদের মতের উল্টো, 'আমি চিন্তা করি' মূলত 'আমি' যা অন্যের মুখোমুখি হলেই তার বোধ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার সাথে সাথে আমার চিন্তার মধ্যে আমি তখন অপরের অস্তিত্বকেও উপলব্ধি করি। অথবা অপরকে আবিষ্কার করি। 'অপর' আমাকে যেভাবে দেখে আমি তার কাছে তার অধিক অন্য কিছু নই, হতেও পারি না। অর্থাৎ 'অপর' আমার দর্পণ। অপরের 'উপস্থিতি' ভিন্ন আমার কোনো আত্মপরিচয় নেই। অপরের অনুপস্থিতি আমার মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে; এখানে একটি মানবিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আমার অস্তিত্বের পক্ষে অপর অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আসে অন্যকে বিচার করার প্রশ্ন। আমরা অন্যকে বিচার করতে পারি না কথাটা এক দিকে খুব সত্য; কিন্তু আর এক দিক থেকে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর হয় না। যেমন, আমরা যেকোনো ব্যক্তির ভালো ও মন্দ এ দুটি গুণ হয়তো জানি। কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি বলে যে, লোকে আমাকে দুর্নীতিবাজ বলে এটি কি সত্য? তার উত্তরে অনেক সময় আমরা বলে থাকি আসলে এটি আমি বলতে পারব না। বস্তুত আমি জানি সে দুর্নীতিবাজ; কিন্তু সম্পর্কের খাতিরে বা ভয়ে আমরা সরাসরি তাকে বলি না যে আপনি দুর্নীতিবাজ। সুতরাং প্রশ্ন আসে এক্ষেত্রে কি আমি ঐ ব্যক্তিকে বিচার করতে পারলাম না। আসলে তা নয়; অস্তিত্ববাদী দর্শনে পক্ষপাতহীন মানবীয় আচরণ করার ইঙ্গিত প্রদান করে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি করতে পারে সেই সত্যিকারের মানবতাবাদী। তবে মানবতার অন্য আরো অর্থ আছে।

> মৌলিকভাবে এটি হলো এ রকম: মানুষ ধারাবাহিকভাবে নিজের বাইরে অবস্থান করে, নিজেকে নিজের বাইরে হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে সে মানুষকে অস্তিত্বশীল করে তোলে এবং অন্যদিকে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত লক্ষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে। যেহেতু মানুষ এভাবে নিজেকে অতিক্রম করে যায় এবং

[161] Loc. cit., p. 29.

> কেবলমাত্র নিজেকে অতিক্রম করার পরিপ্রেক্ষিতেই সে লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তাই সে নিজেই তার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত অবস্থার কেন্দ্রস্থল ও মর্মস্থলে অবস্থান করে।[১৬২]

ব্যক্তিমানুষের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। তাই অস্তিত্ববান মানুষ হিসেবে আমার সিদ্ধান্ত খামখেয়ালি হবে না কখনোই; বরং সে হবে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিল্পকর্ম। Jean-Paul Sartre', বলেন, "...We define man only in relation to his commitments; it is therefore absurd to reproach us for irresponsibility in our choice. "[163] কোনো শিল্পী যদি ছবি আঁকতে গিয়ে কোনো পদ্ধতি বা সূত্র অনুসরণ না করে স্বেচ্ছাচারিকভাবে কোনো ছবি আঁকে তাহলে এ ধরনের শিল্পীকে কি আমরা নিন্দা করব? উত্তরে বলব না, তা করা যাবে না। কোনো শিল্পী কী ধরনের ছবি আঁকবেন তা আগে থেকে কেউ নির্দিষ্ট করে দিতে পারে না। নির্দিষ্ট হয়ে থাকতেও পারে না। যে ছবি শিল্পী আঁকবেন, তা তাঁকে আঁকতে হবে বলেই তিনি আঁকবেন। সবাই জানেন নন্দনতত্ত্ব কোনো চির নির্দিষ্ট অচলায়তন বিধান নয়, তবু নন্দনতত্ত্ব একটি বিধান যা শিল্পীর কল্পনায় বিধিবদ্ধ হয় ও সে বিধান স্বীকার করে মনের ক্যানভাসে বাস্তব হয়ে ওঠে। তাইতো আজ কেউ বলতে পারে না আগামীকালের শিল্প কোন ধারায় চলবে, কী চেহারা নেবে। যে শিল্প এখনো কল্পনায় অবাস্তব, তাঁর সৌন্দর্য কেউ বিচার করতে পারে না। শিল্পকর্ম নিয়ে সার্ত্রে যে নীতিসূত্র অবতারণা করেছেন তা শিল্পকর্মের মতো সৃষ্ট হয়। আমরা শিল্পকর্মকে যেমন দায়িত্বহীন রচনা বলতে পারিনে, তেমনি নৈতিকতাকেও নয়। আমরা যখন পিকাশোর কোনো ক্যানভাস দেখি তখন এটি পরিষ্কার বুঝি যে, ছবিটা আঁকার সময় তিনি যে মানসিক অবস্থায় ছিলেন চিত্রটি তার সে সময়কার প্রকৃতিরই প্রতিফলন। বুঝতে পারি তাঁর চিত্রগুলো তাঁর সমগ্র জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তারা তাঁর জীবনের অবিভাজ্য অখণ্ড অংশ। নান্দনিক বিষয়ে এই যে নীতিসূত্রের বাস্তবতা তার ব্যত্যয় নেই। অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিক নীতিসূত্র উভয় নির্মিত হয় ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সার্ত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তাকে বিচার করার অধিকার কোনো অবস্থাতেই আমার নেই; কিন্তু তার আত্মপ্রবঞ্চনার দোষ ব্যাখ্যা করার অধিকার আমার অবশ্যই থাকছে। লক্ষ্য নির্বাচনে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অকপটতা কিংবা চতুর অসততা উভয়ের প্রভাবই সমাজের ওপরে সমানভাবে প্রতিফলিত হয় বলেই এ অধিকার থাকছে।

আমরা তাকেই বলি আন্তরিক লক্ষ্য যার পিছনে আছে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন। কিন্তু ব্যক্তির এ স্বপ্ন সফল হয় অথবা এ স্বপ্নের সাফল্য নির্ভর করে অন্য মানুষের নির্বন্ধ স্বর্গরাজ্যের ওপরে। ঘুরিয়ে বললে, আমাদের নিজেদের মুক্তির ওপরেই নির্ভর করে অপরের মুক্তি। নিজের মুক্তির জন্য ব্যক্তিমানুষ জনতার অনুভূতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে এক অনন্য ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে মুক্তি লাভ করতে পারে। সার্ত্রে বলেন, "Since

---

162 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, A¯ÍZev‘ I gvbexq Av‡eM, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

163 Jean-Paul Sartre', *Existentialism and Humanism,* op. cit., p. 50.

man is thus self-surpassing and can grasp objects only in relation to his self-surpassing he is himself the heart and centre of his transcendence. "[164] এখানে 'transcendent aim' অনুসরণ করে ব্যক্তি সবসময়ই একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টি করার মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। আর অস্তিত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের মুক্তি এবং অপরের মুক্তি সম্ভব বলে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মনে করেন। তাহলে এটি স্পষ্ট যে, আমি যদি মুক্তি চাই তখন সাথে সাথে অন্য সবার জন্যও মুক্তি চাই। আমার মুক্তির লক্ষ্যের ভিতরে অন্যের মুক্তির লক্ষ্য নিহিত না থাকলে আমার মুক্তির লক্ষ্যও মিথ্যে হয়ে যেতে বাধ্য। যদিও অন্যের স্বাধীন হওয়ার শপথ আমি বদলে দিতে পারি না, পারি না অন্যের নীতিসূত্র বাতলে দিতেও। নীতিসূত্র বস্তুত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক, তৎসত্ত্বেও যেমন স্বাধীনতার পথ তেমনি নীতিসূত্রও কিছু পরিমাণে সর্বজনীন, তারও প্রকৃতির একটি দিক সর্বজনে সাধারণ। এখানে কান্টের বুদ্ধি স্বীকার করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা হলো একটি সংকল্প; সেটি একাধারে যেমন নিজের জন্যে তেমনি অপরের জন্যও। কিন্তু কান্টের যুক্তিকে প্রতিবাদ করে বলেছেন, কথাটা স্বাধীনতার পক্ষে সত্য হলেও নৈতিকতার পক্ষে সত্য নয়। কারণ এমন কোনো সর্বজনীন নীতিসূত্র আবিষ্কার করা যাবে না, যাতে করে নীতির দিক থেকে কোনো একটি সিদ্ধান্ত সবার জন্য চূড়ান্ত হতে পারে।

কান্টের কথার পথ ধরে জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর কথার ইতি টেনে বলেন, "মানুষ নিজেকে তৈরি করে, সে (তার স্বভাব) পূর্ব থেকে সৃষ্ট নয়; নৈতিক মূল্য নির্বাচনের মাধ্যমে সে নিজেকে সৃষ্টি করে এবং তার ওপর পরিবেশের এতই প্রভাব যে, সে নৈতিক মূল্য নির্বাচন না করে পারে না।"[১৬৫] এ শুদ্ধ জীবনযাপন করা ছাড়া জীবনের কোনো অর্থ হয় না। জীবনের অন্যতম কোনো অর্থও নেই। জীবনকে অর্থযুক্ত করার দায় জীবিতের। আর এখানেই আমরা খুঁজে পাচ্ছি মানবসমাজ গড়ে ওঠার কারণ। এজন্যই জাঁ-পল্ সার্ত্রে অবশেষে বলেছেন, 'Existentialism is a form of human' । সার্ত্রের এ মানবতাবাদ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য কী? নামক গ্রন্থে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে 'কলা কৈবল্য'-এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সংসারে যেগুলো অবাস্তব সমস্যা তার থেকে শিল্পীর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে এটি একটি মানবতাবিরোধী আন্দোলন। তিনি বলেছেন, এ পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব কথাশিল্পীর। যে শিল্প-সাহিত্য মানবজাতির উন্নতির প্রয়োজনে নিযুক্ত থাকে না তার শিল্পসৃষ্টি মিথ্যে বলে ঘোষণা করেছেন সার্ত্রে। কথাশিল্পী তাঁর কলম ব্যবহার

---

164 Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism,* op. cit., p. 55.

165 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness,* op. cit., p. 50.

> Man makes himself; he is not found ready-made; he makes himself by the choice of his morality and he cannot but choose a morality, such is the pressure of circumstances upon him.

করবেন শ্রমিকের জন্য ও বঞ্চিতদের জন্য। শিল্পীই খুঁজে বের করে উন্মোচন করবেন পৃথিবীতে তিনি কিছু পরিবর্তন আনতে চান। পরিবর্তন আসলে মুক্তির পথের দিকে নিয়ে যায়-পৃথিবীর মানবজীবনের অস্তিত্ব ভাঙাগড়ার মাধ্যমে। শুধু নিজের মুক্তির জন্য লিখলে হবে না, বরং পাঠকের মুক্তির জন্যও তাঁকে লিখতে হবে। Art for art's sake-এর যারা প্রবক্তা তারা কেবল নিজের সুখ চায়, ভুলে যায় নিজের পূর্ণ তৃপ্তির জন্যে অপরকে দরকার। সুতরাং অপরকেও তৃপ্তির জন্য কিছু দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে অকাট্য উচ্চারণ করেছেন, "...For the moment I feel that my freedom is indissolubly linked with that of all other men. It can not be demanded of me that I use it to approve the enslavement of a part of these men. Thus the writer, a free man addressing free man has only one object-freedom."[১৬৬] "আমার মুক্তি সবার মধ্যে, সবার মুক্তি আমার মধ্যে"-একথা উচ্চারণ করে সার্ত্রে অবশেষে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মানবতাবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন, কোনো বিষয়বস্তুর অভাব বা চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্র করে 'আমি'র সাথে 'অপর'-এর সংঘাত। আমি অপরকে সন্দেহের চোখে দেখি, অপরও আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কেননা যেহেতু আমার ভয় হচ্ছে আমার প্রয়োজনের অংশটুকু সে কেড়ে নেয়। আমরা সচ্ছল হলে এ ব্যাপারটা থাকত না। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বদাই অভাব। এখন অভাবকে শত্রু মনে করে তার বিরুদ্ধে আমরা যদি লড়তে ঐক্যবদ্ধ হই তবে আমাদের মধ্যে আর সংঘাত থাকে না। সংঘবদ্ধভাবে পৃথিবী দোহন করে আমরা পুষ্ট হতে পারি। গড়ে তুলতে পারি শান্তিপূর্ণ মহান মানব সভ্যতা। কিন্তু অধিকতর ক্ষমতা, সম্পদ লাভের ইচ্ছা ও পুঁজিবাজার দখলের চেষ্টায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে সমষ্টির কোন্দল থাকবেই। এ সংঘাত থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা দরকার। আর বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন হতে হবে। আমি নিজে স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে আমার মতো স্বাধীন করার চেষ্টা করি। এ প্রসঙ্গে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "I cannot make my own freedom my aim unless I make the freedom of others equally my aim. "[167]

পরিশেষে সার্ত্রে প্রত্যাশা করেছিলেন, বাস্তবতা আর জীবনের অন্তঃস্থিত মহান ও অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সব প্রকার বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা, নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, হতাশা, প্রলোভন, আত্মতৃপ্তির মনোভাব, ভয়ভীতি ও লক্ষ্যহীনতাকে পরিহার করে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য যে ব্যক্তি সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত-সেই হবে যথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তি-যিনি সমাজের সব মানুষের কল্যাণ সাধন করে মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় দিবে।

---

166 Ibid., p. 64.

167 Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism*, op. cit., p. 52.

৩.৩ e¨w³gvb‡li Rxeb I A¯ÍZev‘

জাঁ-পল সার্ত্রে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলেন। তার হেতুসমূহ হলো, তিনি পৃথিবীর প্রতিটি যুদ্ধের বিভীষিকা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, কোনো যুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন অস্তিত্বকে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে এবং ব্যক্তিমানুষকে করেছে বিভিন্নভাবে শোষণ। তাই ব্যক্তিমানুষের তার নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধবাজ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ দর্শনে বলা হয়েছে, ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব যখন সংকটে পতিত হয় এবং ব্যক্তিমানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে; তখন সে তার অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চেতনা উদয় হয় পরাধীনতা, দুরবস্থা ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য। সে জন্যই ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। যেমন, আলজেরিয়ার যুদ্ধে জনগণ যে অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করেছিল সে অঙ্গীকার বা উদ্দেশ্য হলো, দেশের অর্থনীতি নির্মিত হবে উৎপাদনশীল অর্থনীতি। দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি হবে মানবিক ও বৈষম্যহীন। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা থাকবে জাতির কর্ণধার নির্বাচনে। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে করা হবে বিজ্ঞানমনস্ক ও নৈতিকতাসম্পন্ন। সর্বোপরি আধুনিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে ব্যক্তিমানুষ অর্জন করেছিল স্বাধীনতা। এ ধরনের অঙ্গীকারপূর্ণ স্বাধীনতা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিমানুষ এ জগতে বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতার সুফল আজও পূর্ণাঙ্গভাবে পায়নি। যেমন, তিব্বত, তাইওয়ান ও ফিলিস্তিনির দেশের ব্যক্তিমানুষ। তারা নিজস্ব স্বাধীন সত্তা দ্বারা নিজ দেশকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সক্ষম নয়। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বিভিন্ন রকম। এ প্রসঙ্গে G. J. Warnock বলেন, "One might say of it a. it is straight b. it looks bent but is really straight, c.it looks bent d. it is bent, statement a. is true b. describes the stick correctly and points out how one might be led to make a mistake about it if unaware of an abnormality. "[168]

ব্যক্তিসত্তা কথা ও কাজের মাধ্যমে যে চেহারা প্রকাশ করে, তা দ্বারা ব্যক্তিসত্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্যক্তিমানুষই কোনো কাজ বা ঘটনার মাধ্যমে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাকে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বলে, যাকে সার্ত্রে অবভাস হিসেবে দেখেছেন। যেমন, পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করার দায়ে কোনো ব্যক্তিসত্তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো। এরূপ অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা দ্বারা ব্যক্তি অস্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে; যা দার্শনিক জন লকের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সাথে অস্তিত্ববাদের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অস্তিত্ববাদে অভিজ্ঞতা প্রদত্ত উপাদান বিচার করার পর যে সংবেদন চেতনা খুঁজে পাওয়া যায় তা দিয়ে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে সচেতন করে এবং নিজস্ব জীবনসহ মানবজীবনে তা প্রয়োগ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ যদি সচেতন সত্তা দ্বারা

---

168 G. J. Warnock, op. cit., p. 67.

বিশ্লেষণ করে অতীতে স্বাধীনতার যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে এবং কেন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, এর উদ্দেশ্য কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। তখনই তার মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা বা অভাববোধ তৈরি হবে। এ ধরনের শূন্যতা দূরীকরণের জন্য সে পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন মানবজীবন ব্যক্তিমানুষের বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন, বাঙালি ব্যক্তিমানুষের জীবনের কথা ড. আমিনুল ইসলাম evOvwji ‘kb I Ab¨vb¨ ceÜ e‡jb, "বাঙালি মাত্রই আবেগপ্রবণ, কর্মকুণ্ঠ, জীবন বিরাগী ও পরলোকমুখী। দর্শনচর্চার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা ও নিরাবেগ যুক্তিনিষ্ঠার প্রয়োজন বাঙালির ঋতু-প্রকৃতিতে তার বড়ই অভাব।"[১৬৯] এ থেকে বুঝা যায়, বাঙালির ব্যক্তিমানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনচর্চা নেই বলেই চলে। তবে স্বাধীন সত্তার দ্বারা নির্বাচন করে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এ দেশের যে মানুষগুলো নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে-সেসব কতিপয় মানুষ জেনে হোক আর না জেনেই হোক এ দর্শনের অনুশীলন করে থাকে। এ দর্শন চর্চা করতে হলে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে কতকগুলো গুণ থাকা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে Antonio Rosmini বলেন, "…We have already explained carefully how intellective perception of individuals takes place, and how we form our ideas about them as we make the judgements affirming their subsistence ..."[170]

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরা হন চিন্তাশীল, বিবেকবান, জীবনমুখী ও কর্মমুখী। তাদের একনিষ্ঠ কর্মস্পৃহার কারণে তারা অস্তিত্বশীল মানুষ হিসেবে টিকে আছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ ব্যক্তিমানুষই দৈহিক সুখ দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার কিছু লোক বিবেক বা প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হয়ে নৈতিকভাবে জীবনযাপন করছে। কিন্তু অস্তিত্বশীল জীবনযাপনে ব্যক্তিমানুষগুলোর সংখ্যা অতি নগণ্য। বাস্তব একটি উদাহরণের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ ব্যক্তিমানুষই জীবন প্রণালি নিম্নে তুলে ধরা হলো, কিছু ব্যক্তিমানুষ শুনেছে দুধ সাদা, কিছু ব্যক্তিমানুষ দুধকে প্রত্যক্ষ করেছে, কিছু ব্যক্তিমানুষ দুধের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং দুধের গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে, সর্বশেষে উচ্চ মার্গের কিছু ব্যক্তিমানুষরা যারা দুধের স্বাদগ্রহণ ও গুণসহ দুধের বহুবিধ ব্যবহার করতে শিখেছে। সর্বশেষে, যে ব্যক্তিমানুষরা দুধের বহুবিধ ব্যবহার করতে জানে সেই ব্যক্তিমানুষই সৃজনশীল ব্যক্তি। অনুরূপভাবে যেসব ব্যক্তি তাঁর অভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তিকে যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে জানে সেসব ব্যক্তিই অস্তিত্বশীল মানুষ। এ ধরনের ব্যক্তি সবসময় নিজের স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন করে, যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে H. J. Blackham বলেন, " The situation in philosophy is changing, I believe, and it is no longer intellectually disreputable to produce works on ethies and aesthetics, or even to specialize in these

---

169 ড. আমিনুল ইসলাম, evOvwji ‘kb I Ab¨vb¨ ceÜ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ১৭।

170 Antonio Rosmini, op. cit., p. 99.

subjects."[171] অস্তিত্বশীল জীবনযাপন করতে হলে ব্যক্তিমানুষকে প্রথমে স্বাধীন বা স্বাতন্ত্র্যবোধ অর্জন করতে হবে তারপর স্বাধীন চেতনার সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে তাকে হতে হবে সব কাজে দায়িত্বশীল ও সৎ। সর্বশেষে ব্যক্তিমানুষ নিজস্ব আত্মসত্তার উন্মেষের জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে ও সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের প্রত্যেকের সমাজ ও রাষ্ট্রকে করবে উন্নত। এজন্য 'অস্তিত্ব' শব্দটি ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি অস্তিত্বশীল জীবনে আসতে চায় তাহলে H. J. Blackham এর উক্তিটি স্বরণ রাখতে হবে, "…I should say we have a long way to go before philosophers, like their continental contemporaries, particularly some existentialists, feel bound to take poetie and imaginative thinking seriously." [172]

অধিকাংশ ব্যক্তিমানুষ অস্তিত্ব বলতে বুঝে থাকেন বিলাসদ্রব্যসহ অন্যান্য ভোগীয় দ্রব্যাদি। এক কথায়, যাদের ক্ষমতা ও অধিক টাকা-পয়সা আছে তারাই এদেশের অস্তিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকেই আবেগপ্রবণ সাধারণ ব্যক্তিমানুষেরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকে। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দর্শনে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি তাকেই বলে, যে ব্যক্তি মানবিক আচরণ করে এবং নিজস্ব স্বাধীন সত্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। যার স্বতন্ত্র গুণাবলি আছে, যা দিয়ে সে সংকটকালেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যার আত্মসম্মানবোধ আছে। কিন্তু যারা সনাতনী চিন্তাকে এবং গতানুগতিক জীবনকে আঁকড়ে ধরে জীবন পরিচালনা করে তাদেরকে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমানুষ বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে Ronald Grimsley বলেন,

> …Existentialism tries to capture the meaning of the individual man in a far more radical way than earliar philosophie. Traditional thought has certainly dwelt upon the problem of man but it is claimed by existentialists that the tendency has always been to think of man in terms of some fundamental concept which is derived from reason rather than from living or lived experience and that it is this fact which has given a rather unreal air to many traditional outlooks. Few will doubt, for example, the deep human concern of Kant's ethics, but (it is claimed) his doctrine of the Goodwill has such an impersonally rational character that it is quite remote from man's true nature as an active, striving being. It fundamental principles seem to be based not on man's concrete experience but on an abstract meditation about human nature.[173]

---

171 H. J. Blackham, *Objections to Humanism,* England, Penguin Books Ltd. 1963, p. 64.

172 op. cit., p. 64.

173 Ronald Grimsley, op. cit., p. 1.

অস্তিত্ববাদী দর্শনের ব্যক্তিমানুষের সাথে ড. কাজী মোতাহের হোসেন 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের আত্মসম্মানী ব্যক্তিমানুষের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এতে আত্মসম্মানী ও সম্মানী ব্যক্তিমানুষের মধ্যে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন এইভাবে,

> যেমন, সম্মানী লোক বুঝে কথা বলে, সময় বুঝে বের হয়, স্থান বুঝে পদার্পণ করে, আর স্বার্থ বুঝে ভাব করে। নইলে তার সম্মান বজায় রাখা ভার হয়ে ওঠে। সে মুক্ত নয়, বন্দি-সততা সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান বলে তার চিত্তের স্থৈর্য্য নেই। যে আত্মসম্মানী লোক এসব থেকে মুক্ত। সে নিজের ভিতরে এমন এক শ্রেষ্ঠ সম্পদের সাক্ষাৎ পেয়েছে, যার মৃত্যু নেই-যা অজর, অমর, অক্ষয়, যা আগুনে পোড়ে না, জলে বিনষ্ট হয় না, দুর্যোগে ভেঙে পড়ে না, শত শত বিপদ আপাদের মধ্য দিয়ে গিয়েও ধ্বংস না হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ পরম বস্তুটি লাভ করেছে বলে সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গতি, সদানন্দচিত্ত–তাকে ভীরুর মতো আগ-পাছ ভেবে চলতে হয় না। সে ভাবনামুক্ত। [১৭৪]

এখানে আত্মসম্মানী ব্যক্তিমানুষ অস্তিত্ববাদী যথার্থ ব্যক্তিমানুষের মতো জীবন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মধ্যে আত্মনিষ্ঠা আছে যার ফলে সে নিজেকে সকল পাপ ও অন্যায় হতে মুক্ত রাখতে পারে। তাই উক্ত গ্রন্থে আত্মসম্মানী ব্যক্তিমানুষকে সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনে যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ বলে আখ্যা প্রদান করা যায়। কিন্তু এসব গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যা খুব কম। কেননা জগতে অধিকাংশ ব্যক্তিমানুষ তোষামদকারী হিসেবে বেঁচে থাকে। তাদের জীবন জৈবিক চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য ভালোমন্দ বিচার করা ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এ ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে অস্তিত্ববাদী দর্শনের চর্চা করে নিজের ভিতরের শক্তিকে বের করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কেননা অস্তিত্ববাদী দর্শন মনে করে যে, একজন মানুষ যা হয়ে উঠতে চায় তা হয়ে ওঠার পূর্ণ অধিকার তার আছে। এজন্য যা দরকার তাহলো স্বতন্ত্র গুণাবলির (Distinctive quality) বিকাশ ঘটানো। এজন্য প্রয়োজন নিজের মধ্যে কার্যনির্বাহী সত্তা সৃষ্টি করা, যে সত্তা নিজে গবেষণার মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ প্রসঙ্গে Robin Morris and Geoff Ward বলেন, "...Planning research offers the opportunity to study how the cognitive system is able to exert executive or attentional control over our thought and actions. Such that we are often able to do what we want, when we want-even when the way forward for reaching our goals is at first unclear. "[175]

এসব জ্ঞানীয় বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনে খুব কম পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা নামক স্বরূপ সত্তা দ্বারা সক্রিয় সত্তার উদ্ভব ঘটাতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ শুধু

---

174 মোতাহের হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

175 Robin Morris and Geoff Ward, op. cit., p. 89.

নিজেরাই ভালো থাকতে চায় এবং সবসময় নিজের ভোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এর একটি অকাট্য প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালের পিলখানা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ড কেন হয়েছে তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিম্নপদস্থ কর্মকতার সুযোগসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করা। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের অস্তিত্ব বিনাশ হয়েছে এবং বিডিআর সৈনিকদের অস্তিত্বও বিচারের মধ্য দিয়ে বিনাশ হওয়ার পথে। এ থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশি মানুষরা নিজেদের অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত না করে শুধু জৈবিক ভোগের বা নিজস্ব স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করে। এ দেশের অধিকাংশ সৈনিকদের শুধু কীভাবে গুলি করে মানুষ মারতে হয় সে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এ শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক শিক্ষাও প্রদান করতে হবে এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের সুযোগসুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে। সবাই যেন একে অপরের পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারে সে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এজন্য সার্ত্রের দর্শনে শুধু নিজের অস্তিত্ব নির্মাণ করলেই চলবে না, সাথে সাথে অন্যের অস্তিত্ব নির্মাণ বা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ নিজে ভালো থাকলে চলবে না অপরকেও ভালো রাখতে হবে। আর অপর মানুষদেরকে ভালো করার জন্য তাদের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করতে হবে। সার্ত্রে সব মানুষকে উৎফুল্ল চিত্তে যৌথজীবনে প্রবেশ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কনফুসিয়াসের চীনের সমাজজীবনে 'মধ্যপন্থার নীতিবিষয়ক' গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। তিনি বলেন, "মধ্যপন্থা অনুসরণ করলে সমাজে যেমন ভারসাম্য সংরক্ষিত হয় তেমনি মানুষের ব্যক্তিসত্তা আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ও অসূয়ার আতিশয্যে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।"[১৭৬]

সমাজজীবনে প্রত্যেক মানুষ যদি নিরপেক্ষ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তাহলে সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক অটুট থাকবে। যার ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে। এটি কেবল সম্ভব ব্যক্তির নিজের অস্তিত্বের প্রতি সচেতন হওয়ার সাথে সাথে অন্যের অস্তিত্বের প্রতিও সচেতন হওয়ার মাধ্যমে। আর এ সচেতন হওয়ার মধ্য দিয়ে এক ধরনের মনুষ্যত্ববোধ তৈরি হবে, যা ব্যক্তির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সহায়তা করবে। এ দর্শন ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও যৌক্তিক আলোচনা এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শিক্ষা প্রদান করে; যাতে সব ধরনের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ হলো কোনো বিষয়ে সমস্যা সমাধান করা এবং সেই সীমানা নির্ধারণ করা; যাতে ঐ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না থাকে। অর্থাৎ চিন্তাকে সুনির্দিষ্ট উপায়ে পরিচালিত করে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে John Heil বলেন, "…include the determinants of

---

176 পরেশচন্দ্র মণ্ডল ও নারায়ণ বিশ্বাস, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০০১, পৃ. ২৮।

the content of my first-order thought. Even more bluntly; if we are willing to grant an externalist account of first-order intentional content, we have no particular reason to balk at an externalist account of second-order intentional content."[177] অধিকাংশ মানুষের চিন্তাভাবনা এলোমেলো বিধায় সুষ্ঠু চিন্তা করার পদ্ধতি সে জানে না, তাছাড়া ঈশ্বরকে সবকিছুর ধারক বাহক মনে করে নিজের চিন্তাশক্তিকে সিদ্ধান্ত নেওয়া জন্য ব্যবহার করতে পারে না। অধিকাংশ মানুষের চিন্তাশক্তি ভোগীয় বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই অন্যের জ্ঞানগত সিদ্ধান্তকে যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এসব কারণেই মানুষের উগ্রবস্তুবাদী মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এ ধরনের মানসিকতা দূর করার জন্য অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চা অত্যাবশ্যক। সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, এরা অতি তুচ্ছ বিষয়ে নিয়ে ঝগড়া থেকে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত করে আবার পরে নিজেদের স্বকীয় অস্তিত্বও ধরে রাখতে পারে না। অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিমানুষরা কথা বলা ও কাজ করার পূর্বে সেই কথা ও কাজের অর্থ, যৌক্তিকতা ও ফলাফল নিরূপণ করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়েছে সেটিও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এ দর্শন ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সচেতন করে এবং সংঘাত এড়িয়ে অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করে। তাছাড়াও এ দর্শন মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতা তৈরি করতে সহায়তা করে মানুষকে প্রগতিশীল হতে শিক্ষা দেয়। তবে প্রতিটি বিষয়ে নেতিবাচক দিক আছে। এ নেতিবাচক দিক এড়ানোর জন্য প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে এবং সেই প্রশ্নের সমাধান নিজেই বের করে। যদিও প্রশ্ন করা মানে হচ্ছে এক ধরনের অজ্ঞতা এবং এতে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়। সর্বশেষে বলা যায়, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন মানবজীবনে প্রয়োগ করলে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হবে উদার, মানবিক ও সহযোগিতামূলক; যার মাধ্যমে রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি জীবন হয়ে উঠবে গতিশীল। তাই ব্যক্তিমানুষের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে নিম্নোক্ত দিকগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যেমন,

> মানুষের মধ্যে ভালো এবং মন্দ দুই-ই দেখা যায়। তবে ভালোর প্রবণতাই প্রধান। সেজন্যই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আবিষ্কার উদ্ভাবন চলছে। মানুষের সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবজাতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত ভালোই জয়ী হবে। আমাদের দেশেও আমরা ভালোকে জয়ী করব। সত্য, সুন্দর, ন্যায়, প্রগতি সবার জীবনকে সুখী, সুন্দর সমৃদ্ধিমান, শক্তিমান ও সৃষ্টিশীল করে তুলব। হীনতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতাকে পিছনে ফেলে সভ্যতাকে জয়ী করতে হবে। বর্বরতা নয়, সভ্যতা। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে

[177] John Heil, op. cit., p. 173।

> বিলুপ্ত করতে হবে শান্তি। সৃষ্টিকঠিনতা ও সভ্যতাকে চিরস্থায়ী করে রাখতে হবে। মানুষ পারবে এবং মানুষই সম্ভাবনায়। [১৭৮]

সুতরাং একটি জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ হতে হবে স্থিতিশীল এবং সমাজব্যবস্থা হবে মানবিক। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের স্বধীন সত্তার মূল্যায়ন থাকবে। এ ধরনের সত্তার ব্যাখ্যা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

178 আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), gwmK cZvKv, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্বরবৃত্ত সাহিত্য ঘর প্রকাশনায়, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১।

৩.৪ Aci e¨w³ I Awg

জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে 'আমি'কে উন্মোচন করেছেন এভাবে, 'আমি' এমন একটি বোধ যা অন্তদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের অনুভূতি জানার মধ্য দিয়ে সব মানুষের অনুভূতি বা মনস্তাত্ত্বিক জগৎকে জানতে পারে। তবে 'আমি' কী ধরনের সত্তা তা কেউ জানতে পারে না। অর্থাৎ তার কাজ বুঝা যায়; কিন্তু সে কী রকম মহাচৈতন্য? যা না থাকলে মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এক কথায় বলা যায়, আমি নামক বোধের মধ্যে সবকিছু বিরাজ করে। তাইতো এ বোধের দরজা খোলার জন্য ব্যক্তির নিজের অনুভূতিতে বার বার আঘাত করতে হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ, একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সবটাই।"[১৭৯] এ মনের মানুষ হচ্ছে নিজের মধ্যে বসবাসরত 'আমি' যা সার্ত্রের দর্শনে চেতনাসম্পন্ন সত্তা। অপরও আমি সত্তার মতো চেতনাসম্পন্ন সত্তা। সে শুধু আমাকে দেখে তা নয়; বরং সে তার বোধ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে আমার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। সুতরাং আমার সাথে অপরের সম্পর্কের সারকথা কথা হলো, সে একজন ব্যক্তি হিসেবে আমার কাছে প্রকাশিত। সার্ত্রে 'অপর' ও 'আমি' সম্পর্কে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করেন, প্রথমটি হলো 'অপরের' অস্তিত্ব নিয়ে, দ্বিতীয়টি হলো 'আমি' সত্তা সাথে অপর সত্তার সম্বন্ধ নিয়ে। অপর ব্যক্তি আমার মতো একজন ব্যক্তি যে চিন্তা করে, যার মধ্যে সংবিদ (চেতনা) আছে এবং আমার নিজের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় অবয়ব দেখা যায়। জাঁ-পল্ সার্ত্রে 'অপর' ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন, "অপর ব্যক্তি কেবল আমাদের কাছে জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণীয় হয়, জ্ঞানটা যদি অনুমানমূলক হয়, তাহলে অপর ব্যক্তির অস্তিত্ব অনুমানসাপেক্ষ।"[১৮০]

সার্ত্রের 'আমি' সত্তা কীভাবে 'অপর' সত্তা গ্রহণ করবে, যেভাবে গ্রহণ করবে 'অপর' ব্যক্তির অস্তিত্ব সেভাবে গুরুত্ব লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর '*Being and Nothingness*' গ্রন্থে বলেন,

> ….being-for-others is not an ontological structure of the for-itself . We can not think of deriving being-for-others from a being-for-itself as one would derive a consequence from a principle, nor conversely can we think of deriving being-for-itself from being-for-others…what the cogito reveals to us here is just factual necessity: it is found-and this is indisputable-that our being along with its being-for-itself is also for others…selfness is reinforced by arising as a negation of another selfness.[181]

---

179 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ।

180 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

181 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness,* op. cit., p. 282.

যেমন, অপর ব্যক্তির আচরণ দ্বারা প্রকাশ পেল তার ভিতরে কোনো জ্ঞানের আভাস নেই, তখন সেই ব্যক্তি আমি সত্তার কাছে বস্তু হিসেবে গ্রহণীয় হবে। আর যদি অপর ব্যক্তির মধ্যে চেতনা আছে দেখা যায় তাহলে সে ব্যক্তি চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আমি সত্তার কাছে তার অস্তিত্ব গ্রহণীয় হবে। এখন আমি সত্তার সাথে কীভাবে অপর সত্তার সম্বন্ধ হচ্ছে, উদাহরণের সাহায্যে তা বুঝানো যেতে পারে। আমি সত্তা নামক চেতনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি চত্বরে বসে আছি। একটু দূরে একজন লোক বসে আছে। একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার মতোই আমি তাকে দেখছি। আবার সাথে সাথে এও উপলব্ধি করছি যে, এ বস্তুটি হলো একটি মানুষ। এটি কী করে সম্ভব? অন্য বস্তুর মতো তাকে মনে করলে তার সাথে সেসব পদার্থের বিশেষণগত সম্বন্ধ হতো। আমার নিজস্ব জগতে তার মাধ্যমে নতুন কোনো সম্পর্ক দেখা দিত না। কিন্তু তাকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করার অর্থ, যে বস্তুগুলো আমার জগৎ গড়ে তুলেছে। সেগুলোর নতুন এক সংস্থান ঘটেছে। এ নতুন সংস্থান আমার আয়ত্তের বাইরে। এখন আর আমার সামনে যে সবুজ জমিটুকু পড়ে আছে–তার দু'পাশে দুটি অজড় বস্তু নেই; বরং দুটি সজীব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সবুজ জমিটিকে এক বিশেষভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছে। আমার এবং তার মাঝখানে যে ব্যবধান বা দূরত্ব, তা যেন নতুন রূপ নিচ্ছে। যে পরিবেশ আমি কতকগুলো বস্তু নিয়ে গড়ে তুলেছিলাম, তা যেন ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু এ পরিবেশ নতুনীকরণ বা পরিবর্তিত হওয়া, তাতে আমার কোনো হাত নেই। এভাবে আমার পরিচিত পরিবেশ ভাঙনের উপাদান থেকে বুঝতে পারি যে, আমার জগতে অন্য মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে বলেন, "আমার জগতের বস্তুগুলোর মধ্যে একটি ভাঙার উপাদানই বলি আমার জগতে অন্যের আবির্ভাব।"[১৮২] কিন্তু এ ভাঙনটা ধীরে ধীরে ঘটে। যেসব বস্তুগুলো আমার সাথে জড়িত সেগুলো তার সম্পর্কে নতুনভাব অবস্থিত হতে থাকে। পার্কে যে মূর্তি আছে, যে গাছগুলো আছে সবই তার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং তার সাথে এসব বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে আমার স্থানগত সম্বন্ধ রয়েছে। যে সবুজ ঘাস এবং অন্য বস্তু কীভাবে দেখছে আর আমি কীভাবে দেখছি। আমারটা আমি জানলেও অপরের দৃষ্টিকে আমি জানতে পারি না। অপর ব্যক্তিকে বস্তু হিসেবে এবং আমাকেও অপর ব্যক্তি বস্তু হিসেবে দেখে।

'অপর ব্যক্তি' আবির্ভাবের ফলে আমার নির্দিষ্ট মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের কথাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং তার কথার অর্থগুলো বুঝার চেষ্টা করি। এ অর্থ বুঝার চেষ্টার মাধ্যমে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজ করতে ব্যর্থ হই। আর এ ধরনের ব্যর্থতার মাধ্যমে আমার সম্ভাবনাময় সত্তা প্রকাশিত হতে বাধা প্রাপ্ত হয়। শেষে আমি নিজেকে অতিক্রম না করে আগের অবস্থানেই ফিরে যাই। মানবজীবনের আমি ও অপর ব্যক্তির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তখন আমার কাছে নিজের ও অপরের অস্তিত্ব চেতনার স্তরে উদ্ভাসিত হয়। আমি যখন যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা অপরকে দাস বা বস্তুতে পরিণত করতে চাই অপরও আমাকে বস্তুতে পরিণত করতে চায়। এভাবে কথার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত বের করে, এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘাত এবং শেষে

---

182 জাঁ-পল্ সার্ত্রে, mËv I kb¨Zv, পৃ. ৭৮।

সহিংসতার রূপ নেয়। তারা ভাবে, মানবজীবনে আমি যেমন অস্তিত্বশীল ব্যক্তি অপর ব্যক্তিও আমার মতো অস্তিত্বশীল। তাই উভয়ই যুক্তির মাধ্যমে নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তবে এর মধ্যে কার যুক্তি বেশি গ্রহণযোগ্য সেটিকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ নিরসন হয়। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের মাধ্যমেই আমি ও অপর ব্যক্তির মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। তাই সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তিময় জীবন গঠনে অস্তিত্ববাদী দর্শন সাহায্য করে থাকে। একে অপরকে বস্তুতে পরিণত করা যে দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ নিজের মধ্যে পোষণ করে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই 'আমি'র সাথে 'অপর' এর সংঘাতের ভূমি। 'অপর ব্যক্তি' আমার সামনে উপস্থিত হয় একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে। এ অপর ব্যক্তি কোনো বিশেষ কাজে কখনো আমাকে বাদ দিয়ে, হিসেবে না ধরে, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তার মানে, তার সাথে আমার সম্পর্ক হয় সহযোগিতার নয় প্রতিযোগিতার, সম্পর্ক নেই এমন অবস্থা কখনোই ঘটতে পারে না। জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "Everything which may be said of me in my relations with the other applies to him as well. While attempt to free myself from the hold of the other, the other is trying to free seeks to enslave me…Conflict is the original meaning of being-for-other…"[183]

মানবজীবনে আমি ও অপর ব্যক্তির মতো বৈপরীত্য নামক দ্বৈত সত্তাকে সার্ত্রে আঁ-সোঁয়া ও পুর-সোঁয়ার মধ্যে লক্ষ করেছেন। প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের চিন্তার প্রকৃতির মধ্যে বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ বৈপরীত্য ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নিজস্ব জীবন পদ্ধতি তৈরিতে সহায়তা করে। এক কথায় বলা যায়, ব্যক্তির অবস্থার (Condition) মধ্যে সর্বজনীনতা নামক বৈপরীত্য সত্তা বিদ্যমান। এ সর্বজনীনতা আসলে মানুষের চারটি চিন্তার প্রকৃতির অন্যতম। আর এ চারটি চিন্তার প্রকৃতি আমি ও অপর ব্যক্তির মধ্যেও বিদ্যমান। তারা যথার্থ চিন্তা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। চিন্তার সর্বজনীন সূত্রকে ব্যবহার করেই আমি নিজেকে প্রসারিত, প্রকাশিত করা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকি। এটি অপর ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উভয় ধরনের ব্যক্তি সব সময় নিজস্ব চিন্তাশক্তিকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা করে দু'ধরনের সত্তাকে খুঁজে বের করে (একটি অপরটির বিপরীত) নিয়ে আসে যা পূর্বে তার মধ্যে ছিল না। এ প্রসঙ্গে Franz Rosenzweig বলেন, "... I really believe that a Philosophy, to be adequate, must rise out of thinking that is done from the personal standpoint of the thinker. To achieve being objective. The thinker must proceed boldly from his own subjective situation. "[184] এ চিন্তা নামক নিজস্ব সত্তা ব্যক্তির মধ্যে সৃজনশীলতাসহ অনন্য গুণ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

---

183 Jean-paul Sartre, op. cit., p. 362.

184 Franz Rosenzweig, *The New Thinking*, New York, Schocken books,1953, p. 179.

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, একজন মানুষের মধ্যে যে যে বৃত্তি আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সে সে বৃত্তিগুলো বর্তমান। যে যে বৃত্তির চাষ করবে, তার মধ্যে সে বৃত্তির ফসল ফলবে অর্থাৎ বৃত্তিগুলো বিকাশের একটি ব্যাপার আছে। এমন একটি বৃত্তি হলো বিবেক। যেমন, বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা তাদের বিবেকবৃত্তির পর্যাপ্ত বিকাশ না ঘটিয়ে প্রবৃত্তির (Propension) বিকাশ ঘটিয়েছে, যার ফলে তাদের দ্বারা অপর ব্যক্তি নির্যাতিত হয়; এতে সে তার অস্তিত্ব গঠনে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা নিজের ও অপর ব্যক্তির অস্তিত্ব গঠনে মারাত্মক বাধা হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রের বক্তব্য হলো, "…By virtue of consciousness the other is for me simultaneously the one who has stolen my being from me and the one who causes there to be a being which is my being…Thus my project of recovering myself is fundamentally a project of absorbing the other…I do not thereby cease to assert the other-that is, to deny concerning myself that I am the other…"[185]

প্রাণীর কথা বলা যায় যে, তারা যে প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় সে প্রবৃত্তি নিয়ে মরে। কিন্তু মানুষের তেমন নির্দিষ্ট কোনো স্বভাব নেই। যেহেতু মানুষের স্বভাব সবার মধ্যে এক রকম নয়, তাই সর্বজনীন অন্তঃসার বলে মানুষের মধ্যে কিছু নেই। প্রত্যেকেই তার নিজের সার নিজে তৈরি করে বলে মনুষ্য প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। যদি কিছু থাকে সে পূর্বোল্লিখিত শর্ত। শর্ত বলতে বুঝায় পৃথিবীতে মানুষের মৌলিক অবস্থান। অবস্থান দু'রকম (ক) মৌলিক এবং (খ) ঐতিহাসিক। এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার জন্য ধনী-দরিদ্র বাউন্ডুলে সংসারী নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে কতকগুলো ব্যাপারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাকেই বলি মৌলিক অবস্থান। কিন্তু ঐতিহাসিক অবস্থান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়। যেমন, কেউ শিল্পপতির ঘরে জন্মে শিল্পপতি হয়, কেউ খেত-মজুরের ঘরে জন্মে খেতমজুর। তাছাড়া মানুষ জন্মানোর পর থেকেই বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে শ্রম দিতে হয়। আর জন্মালে মরতে হবে তারও কোনো ব্যত্যয় নেই; এগুলোই মৌলিক অবস্থান, এগুলোই সীমাবদ্ধ অবস্থান। এ সীমাবদ্ধতা না বিষয়গত না বিষয়ীগত অথচ বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ই এখানে জড়িত। এ ধরনের বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে Gabriel Marcel বলেন, "… So one is led to make a fundamental distinction between existence and objectivity, a distinction which in no way coincides with the one that traditional idealism, particularly since Kant, between subjectivity and objectivity. "[186]

বিষয় (Objectivity) ও বিষয়ী (Subjectivity) মধ্যে শুধু বিষয়ের অস্তিত্ব কিছুটা মানুষের দ্বারা আর প্রকৃতি নিয়ম দ্বারা তৈরি। কিন্তু বিষয়ী অস্তিত্ব শুধু মানুষের নিজস্ব চেষ্টার ফল। যারা নিজেকে উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন

---

185 Ibid., p. 263

186 Gabriel Marcel, op. cit., p. 43.

মানুষ হিসেবে তৈরি করে তারাই কেবল 'আমি' ও 'অপর'-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। যদিও প্রথমত সব মানুষ মানুষকে বিষয় হিসেবে দেখে ও মনে করে। কিন্তু যাকে দেখে তার সাথে কথা বলে ও কাজ করে, তখন একে অপরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিজের মূল্য কতটুকু তা নির্ধারণ করে, প্রশ্ন করে আমাদের মধ্যে কে বিষয় আর কে বিষয়ী। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে একে অপরকে বিষয় বানানোর চেষ্টা করতে গিয়েই ব্যক্তি স্বচেতনা লাভ করে। এ ব্যক্তিসত্তার স্বচেতনা দিয়ে আমরা বাইরে পৃথিবীতে সর্বত্র যে বিষয়গুলো জানতে ও চিনতে পারি এবং তাদের সম্পর্কে চেতনা লাভ করি। আবার বিষয়ী সত্তা যেহেতু আমাদের জীবনযাপনের মধ্যেই রয়েছে, সেহেতু সে রকম জীবনযাপন আমরা করি, যা দ্বারা অপর ব্যক্তি প্রভাবিত হয়। তবু সে সাবজেকটিভিটি মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রেরণা। মানুষের সে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কখনোই এক রকম নয় বলা যায়, অসংখ্য রকম আর তার কোনটাই মানুষের কাছে আগন্তুক নয়। তিনি সে উদ্দেশ্যগুলোর কোনটি মুছে ফেলতে হবে, কোনটিকে সীমিত করতে হবে, কোনটিকে অস্বীকার করতে হবে, কোনটির সাথে সমঝোতায় আসতে হবে এবং কোনটিকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ধরতে হবে, তা বিষয়ীসত্তা নির্ধারণ করবে। ফলত প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা সে যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন তার একটি সর্বজনীনতা আছে। আছে বলেই একজন চীনার কিংবা নিগ্রোর উদ্দেশ্য যেমন একজন বাংলাদেশি হয়েও আমি বুঝতে পারি তেমনি একজন বাংলাদেশি কি ইউরোপীয়ের উদ্দেশ্য বা একজন চীনা কিংবা নিগ্রো অনুমান কিংবা অনুভব করতে পারে এবং তা বুঝতে পারে। উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্বজনীনতা আছে বলেই এটি সম্ভব; তাই বলে সে উদ্দেশ্য দিয়ে একজনকে জন্মের মতো বিচারবিশ্লেষণ করা যায় না এবং চিহ্নিত করাও যায় না। অথচ যথেষ্ট খবরাখবর জানা থাকলে, অথবা মানুষ চেনার অধ্যবসায় থাকলে যে-কেউ হারানো শিশু, আদিবাসী বা বিদেশি মানুষকে বুঝতে পারে।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, ব্যক্তিমানুষ সংকট মুহূর্তে নিজের দোষ-গুণ আবিষ্কার করতে হয়। এ কারণেই ব্যক্তি সংকট মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকেই উন্মোচিত করে নিজের সদর্থক গুণগুলো বিকাশ ঘটায়। সংকটময় পরিস্থিতিই মানুষকে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে পরিস্থিতির ওপরে প্রভুত্ব করে নয়তো সে পরিস্থিতির দাস হয়ে। সুতরাং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অপর মানুষকে নিন্দা করা নিরর্থক, সেটি অবান্তরও বটে। কারণ অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমি হলে কী করতাম সে সিদ্ধান্ত দিয়ে অন্যের সিদ্ধান্ত নির্ণয় বা বিচার করা যায় না। যেহেতু আমি ও সে এ দু'য়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বিস্তর। এজন্য জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, "The for-itself is the foundation of all negativity and of all relation. The for-itself is relation. "[187]

[187] Ibid., p. 362.

আমি ও অপর ব্যক্তি দ্বন্দ্বময় অবস্থা অতিক্রম করে যখন একে অপরের সহযোগিতা দ্বারা অর্থময় জীবন তৈরি করব, তখন আমি অপর ব্যক্তির প্রতি সহনশীল হব। অপরও আমার প্রতি অনুরূপ আচরণ করবে। এর জন্য প্রয়োজন উভয়েরই শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে Antonio Rosmini বলেন, "…It may be objected that free, human activity, which renders the human being masters of his own powers, can direct attention where it wills, and specifically to ideas in their entirety, or to parts of ideas. "[188]

প্রতিটি কাজের ও ব্যক্তির প্রতি গভীর মনোযোগ আসলে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা চলে আসবে। এ ধরনের আচরণ আমি ও অপর ব্যক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং একই সাথে সহযোগিতা তৈরি করবে। জীবন চলার পথে ব্যক্তি ও অপর ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যত কঠিন বিপদই আসুক না কেন, বিচারবিবেচনা করবে তোমার কাছে কি আছে সেটি, যেটি নেই সেটির জন্য আফসোস দরকার নেই। জীবনে আরামে থাকাটা বড় অর্জন নয়। জীবনে মানুষের বড় অর্জন হলো বিপদের হার মেনে না নিয়ে সংগ্রাম করে ঘুরে দাঁড়ানো। বিপদের সময় প্রশ্ন একটিই যা নেই সেটির কথা ভেবে হার মানবে না, যা আছে সেটিকেই শক্তি ভেবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে নীৎশের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "ধীর স্থির, প্রসন্নচিত্ত, নির্ভীক, আত্মনির্মাণে সমর্থ, প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাসের আগাগোড়া নতুন করে মূল্যায়নে উদ্যোগী, শিল্প এবং সৌন্দর্য স্রষ্টা এবং ভোক্তা, স্বাধীনবৃত্তি ও অনিয়ন্ত্রিত–স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এসব গুণের যারা অধিকারী তারা অবশ্যই সম্মানী।" [১৮৯]

জাঁ-পল্ সার্ত্রে দৃষ্টিতে তারাই অস্তিত্বশীল ব্যক্তি যারা শুধু নিজেরা আরাম আয়েশে মত্ত থাকে না; বরং অপরকেও ভালো করা ও ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে। আমি দ্বারা অপর ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এক অখণ্ড বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সংঘ গড়ে তুলবে এটি ছিল সার্ত্রের প্রত্যাশা।

---

188 Antonio Rosmini, op. cit., p. 63.

189 বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), bxr‡k, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ২১।

3.5 A¯ÍZev‡`i mv¤úwZK avivi

জ্যাঁ-পল্ সার্ত্রের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড শুধু যে পাশ্চাত্য জগৎকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা নয়, তৃতীয় বিশ্বেও সেই চিন্তাধারার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আমাদের অনেকেই হয়ত বিশদ কোনো খবর রাখি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের অজ্ঞাতসারেই সার্ত্রের চিন্তাধারা নানা মাধ্যমে (সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস ও চলচ্চিত্র প্রভৃতি) সূক্ষ্মভাবে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আঘাত করার মাধ্যমে চেতনার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক মানসিকতা বলতে যা বুঝায়, তা মূলত, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের কাছে ঋণী। এ প্রসঙ্গে James Collins বলেন, "... Jean-Paul Sartre states explicity that free choice, liberum arbitrium in the classical sense, is only an act of announcing projects and decisions already made by pure consciousness. More precisely, conscious subjectivity is nothing else than a series of acts, each of which is a free act in so far as it embodies this primal dynamism…"[190]

জাঁ-পল্ সার্ত্রে সম্পর্কে উপরের উক্তি থেকে বলা যায় এ দর্শন আত্মঅতিক্রমণকারী, বাস্তবধর্মী ও জীবনমুখী। ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত হবে সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এ দর্শন ব্যক্তিমানুষকে নির্বিচারে অতি-প্রাকৃতিক শক্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য নসিব নির্মাণে বিশ্বাসী।

জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ দর্শন সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি চারটি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। GK. এ সম্প্রদায়ের প্রায় সব দার্শনিকই ব্যক্তিসত্তার পূর্বে সাধারণ সত্তাকে স্বীকার করার বিরোধী অর্থাৎ তাদের মতে, ব্যক্তিসত্তা সারসত্তার পূর্বগামী। 'B. নৈতিকতা ও সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শন আত্মনির্মাণে বিশ্বাসী ও আত্মকেন্দ্রিক। wZb. এ দর্শনে ব্যক্তিসত্তার নির্মাণটি হবে সকল মানুষের পথ প্রদর্শক হিসেবে। Pvi. ব্যক্তিসত্তা নিজ স্বাধীন সত্তার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথমত, ব্যক্তিসত্তা সারসত্তার পূর্বগামী সম্পর্কে জাঁ-পল্ সার্ত্রে বলেন, মানুষ কোনো সার্বিক ভাবসত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং তার মানবজীবন শুরু হয় স্বভাবশূন্য সাধারণ অস্তিত্ব নিয়ে। ব্যক্তি স্বভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে সংগ্রাম করতে হয় জীবনব্যাপী। ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই তার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে কর্মপন্থা নির্বাচন করতে হয়, সম্মান-মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশও সৃষ্টি করতে হয় নিজেকেই। এজন্য বলা হয় ব্যক্তিসত্তা সারসত্তার আগে। দ্বিতীয়ত, সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেন ব্যক্তিসত্তা কারো নয়, সে নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলবে, সে তাই হবে। অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যক্তিসত্তা নিজেকে গড়ে তুলতে আত্মকেন্দ্রিকতা নিমজ্জিত হয়, এজন্য সার্ত্রে দর্শনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব। যা গতানুগতিক মূল্যবোধ থেকে পৃথক। তৃতীয়ত, প্রত্যেক মানুষকে সকল মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সার্ত্রে বলেন, প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

190 James Collins, op. cit., p. 22.

ব্যক্তিমানুষকে সকল মানুষের দায় গ্রহণ করতে হয় বলে ব্যক্তিসত্তা সমগ্র মানবজীবন মনস্তাপ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। চতুর্থত, ব্যক্তি স্বাধীন বলে সে চিরায়ত মূল্যবোধ ও অভ্যাসকে অস্বীকার করে নিজস্ব মূল্যবোধ ও স্বভাব নির্মাণ করে যেন সকল মানুষ তা অনুসরণ করে। তাছাড়া সার্ত্রে ব্যক্তিমানুষের চারটি স্বরূপ সত্তা কথা বলেছেন, মানুষ অবস্তু, স্বাধীন, ভালোকে নির্বাচন করে এবং পূর্ণতা অর্জন করতে চায়। এ চারটির মধ্যে স্বাধীন সত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহারই ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, আর একে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে অকল্যাণকর। ব্যক্তি যখন কোনো সংকটে পতিত হয়, তখন এ স্বাধীন সত্তা দ্বারা সংকট মোকাবিলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং এর মাধ্যমে নিজের স্বকীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। এজন্য স্বাধীন নির্বাচনই মানবজীবনে ব্যক্তিমানুষের দেহ-মনের সাথে কর্মের শৃঙ্খলা এনে নিজ জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে বৃহৎ মানব কল্যাণ সাধন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে A. D. Lindsay বলেন,

"… He disciplined his mind and body by such a course of life, that he who should adopt a similar one, would, if no supernatural influence prevented, live in good spirits and uninterrupted health; nor would he ever be in want of the necessary expenses for it. "[191]

এ জগতে আবির্ভাব পিছনে ব্যক্তি নিজে দায়ী না হলেও সকল সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার। জাগতিক জটিল পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং নিজস্ব নির্বাচন অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তোলার কাজটিও নিজেকেই করতে হয়। এজন্য মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নসিবের বিধাতা এবং নিজেকে প্রতিনিয়তই সঠিকভাবে তৈরি করার মধ্য দিয়ে সে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝানোর জন্য সার্ত্রে 'সত্তা ও শূন্যতা' নামক গ্রন্থে আঁ-সোঁয়া ও পুর-সোঁয়া নামক দু'ধরনের সত্তার কথা বলেছেন, পুর-সোঁয়াকে স্বাধীনসত্তা বা স্বনির্ভর সত্তা বলেছেন; যা আঁ-সোঁয়া (অচেতন সত্তা) থেকে আলাদা। এ স্বনির্ভর সত্তা তার চেতনার মাধ্যমে বস্তুসহ যেকোনো বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। আর আঁ-সোঁয়াকে বলেছেন, অপরিবর্তনশীল সত্তা, যার সীমাবদ্ধতা আছে; যা একটি বস্তুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বুঝায়। যেমন, একটি কাগজ, কলম, ইট, পাথর ও মোবাইল প্রভৃতি। মানুষ আঁ-সোঁয়া বা অচেতন বস্তুর মতো নয়, মানুষ হচ্ছে পুর-সোঁয়া। এ পুর-সোঁয়া হলো চেতনসত্তা, যা একমাত্র মানুষেরই আছে। এজন্য মানুষ নিজেই নিজের পথ তৈরি করে, নিজের স্বভাব নিজেই বিকাশ ঘটায়। এভাবে অস্তিত্ববাদ দর্শন মানুষের অস্তিত্ব তৈরি করে এবং চেতন সত্তাকে অচেতন সত্তা থেকে পৃথক করে ব্যক্তিমানুষকে আত্মমুখী করে তুলে যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ আত্মমুখী দর্শন সার্ত্রে নিজ জীবন যেভাবে কার্যকর করেন, তা নিম্নে বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো,

---

191 A.D. Lindsay, op. cit., p. 21.

> বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে, তা তাকে সবার সাথে একত্রে দাঁড়াতে শিক্ষা দেয়; বিরক্তবোধ করার বদলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে যৌথজীবনে অংশগ্রহণ করেন। সুবিধাভোগকে তিনি ঘৃণা করতেন, তাঁর আত্মসম্ভ্রমের দাবি ছিল তিনি নিজের শক্তিতে পৃথিবীতে তাঁর স্থান জয় করে নিন: জনগণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে, অন্য অনেক সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা হয়ে শূন্য থেকে যাত্রা করে তিনি তাঁর উদ্যমকে সফল করার চেষ্টার মধ্যে এক বিপুল সন্তোষ বোধ করেন, তিনি অনেক বন্ধু পান, তাঁর চিন্তাভাবনাকে অন্যদের কাছে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি কর্মকাণ্ড সংগঠিত করেন, বন্দিশিবিরের সবাইকে জুটিয়ে বড়দিনের সময় অভিনয় করান জার্মানদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর নাটক 'বারিওনা' তা দেখে তারিফ করে। সাথিত্বের কাঠিন্য ও উষ্ণতা তাঁর মানবতা-বিমুখ স্ববিরোধগুলো খুলে দেয়; প্রকৃতপক্ষে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিরুদ্ধে, যে মানবতাবাদ পূজা করে মানুষের মধ্যে এক মানব প্রকৃতিকে। কিন্তু মানুষকে যদি নতুন করে নির্মাণ করতে হয় তাহলে সে কাজের চেয়ে উদ্দীপনাময় কাজ আর কিছু তাঁর কাছে নেই। তখন থেকে ব্যক্তিতা এবং যৌথতাকে পরস্পরবিরোধী মনে করার বদলে তিনি তাদের পরস্পর সংযুক্ত করে ভেবেছেন, অন্য কোনোভাবে নয়। তাঁর স্বাধীনতাকে তিনি বাস্তবায়িত করবেন আত্মগতভাবে পরিস্থিতির সাথে স্বীকৃতির দ্বারা নয়, করবেন বস্তুগতভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্বারা, তাঁর আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য এক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলে। যে গণতান্ত্রিক নীতির তিনি অনুগত ছিলেন, তার দিক থেকেই সে ভবিষ্যৎ ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রবাদ থেকে তিনি যে আগে দূরে সরে ছিলেন তার একমাত্র তাঁর এ ভয় যে, সমাজতন্ত্রে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। এখন তিনি সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে দেখলেন মানবজাতির একমাত্র উদ্ধার-পথ এবং সেই সাথে তাঁর নিজের সার্থকতার উপায়।[১৯২]

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দর্শনের কার্যকর দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয় (অর্থাৎ সার্ত্রের দর্শনে আঁ-সোঁয়ার বা স্বস্থিত সত্তার মতো)। তারা নিজের স্বভাব ও স্বরূপকে ঠিকমতো বুঝে না এবং নিজে যা বলে তা বিশ্বাস করে না। কেননা তারা মূল্যবোধহীন, পরশ্রীকাতর, বস্তুবাদী, উগ্র বস্তুবাদী, পরলোকমুখী, অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ, বিবেকহীন, মেকী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও স্থূল চিন্তার অধিকারী। এসব মানুষের মধ্যে উক্ত অশুভ আবেগগুলো দূরীভূত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের পুর-সোঁয়া মতো চেতন সত্তা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্মাণের ধারাবাহিকতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। নিম্নে ডায়াগ্রামাকারে সার্ত্রের অস্তিত্ব নির্মাণের ধারাবাহিকতা দেখানো হলো,

192 অরুণ মিত্র, Abev'msMn 1, সম্পাদনা : চিন্ময় গুহ, কলকাতা, গাঙচিল প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

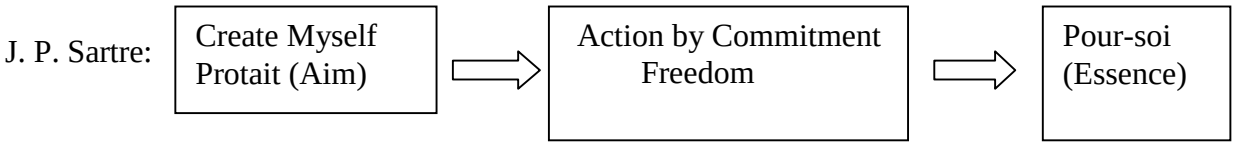

বর্তমান অবস্থায় জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ দর্শন যেভাবে এদেশের মানুষের ওপর কার্যকর করা সম্ভব:

এদেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ সাধারণত অশিক্ষিত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অভাবী। তারা দুবেলা দুমুঠো খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। এসব মানুষের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি দিক কার্যকর করা যায়। তা হলো:

অস্তিত্ববাদী দর্শনের শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলো বিকাশ ঘটায়। যা এদেশের উগ্র বস্তুবাদী ও স্থূল চিন্তার মানুষের স্বভাব পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

এ দর্শন উন্নত জীবনবোধ নির্মাণে ধারণা প্রদান করে এবং পুরাতন অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনবোধ গ্রহণের গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মানুষকে পথ দেখাতে পারে।

এ দর্শন মানবিক মূল্যবোধ ও স্বাধীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তিসত্তার তথা দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে।

অল্পশিক্ষিত রক্ষণশীল সমাজে এ দর্শন প্রয়োগ ঘটিয়ে মানুষকে প্রগতিশীল করে তুলতে সহায়তা করে।

উচ্চশিক্ষিত সমাজে এ দর্শন কার্যকর করা আরও সহজ ও সম্ভব। কেননা এসব মানুষ চেতনাসম্পন্ন বিধায় তারা সার্ত্রের দর্শনের শুভ দিকগুলো আয়ত্ত করে নিজ জীবনে কার্যকর করতে পারবে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এ দর্শন কার্যকর করা সম্ভব। তারা প্রচার করবে অস্তিত্ববাদ এমন একটি দর্শন যা ব্যক্তি মানুষকে তার স্বাধীন ও সততা সম্পর্কে সচেতন করে এবং তা নিজ জীবনে অনুশীলন করে ব্যক্তি নিজের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। বস্তুত, স্বাধীনতা ও সততাভিত্তিক কোনো নির্বাচনই মূল্যবোধের ভিত্তি। আমরা যাকে মূল্যবোধ বলি, আসলে তা ব্যক্তির স্বাধীনতাভিত্তিক চেতনারই ফল। তাছাড়া সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল ব্যক্তির আত্মচেতনারই সৃষ্টি।

সার্ত্রে মানবচৈতন্যকে এক আত্মনির্ভর স্বসত্তাক পদার্থ বলেছেন। এ ধরনের স্ব-সত্তাক দ্বারা উদীয়মান রাজনীতিবিদগণ নিজেদের সুকুমার বৃত্তি বিকশিত করে জনগণের কল্যাণে কাজ করে তাহলে বাঙালি সমাজের চিত্র পরিবর্তন হবে।

সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চা করলে প্রত্যেক সরকারি আমলা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নীতিবান হবে। যার ফলে দেশে দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তিকে যেভাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন-সেভাবে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ অপর ব্যক্তিকে সম্মান-মর্যাদা প্রদান করে তাহলে দেশে সহযোগিতা মনোভাব তৈরি হবে। যার ফলশ্রুতিতে দেশে প্রভুত্ব উন্নতি সাধিত হবে।

সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শন চর্চা করলে ব্যক্তি সমাজের একজন হিসেবে ক্ষমতা আরোহণ করে তাঁরা নিজেদেরকে প্রভু না ভেবে জনগণের সেবক মনে করবে। এতে দেশের দৃশ্যপট পাল্টে যাবে।

যারা দেশকে পরিচালনা করেন তারা হলেন সরকারি সকল স্তরের আমলা ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি । তাঁরা যদি অস্তিত্ববাদের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে খাঁটি মানুষে পরিণত হোন-তবে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে সকল জনসাধারণও খাঁটি মানুষে পরিণত হবে । সুতরাং বলা যায়, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের সঠিক চর্চা করলে এদেশও পাশ্চাত্য দেশের মতো উন্নত হবে ।

সর্বোপরি, অস্তিত্ববাদ দর্শনকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে, রেডিও, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট, ইউটিউব, সেমিনার ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করলে এ দর্শন কার্যকর করা সম্ভব হবে; আর তখন সমাজের প্রত্যেক মানুষ কুসংস্কারমুক্ত, বিবেক শাসিত, নির্মোহ, নির্লোভী ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে ।

এ দর্শন কার্যকর করতে গিয়ে কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। পরিপূর্ণরূপে সফল প্রয়োগের জন্য এ নেতিবাচক দিক নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো,

জাঁ-পল্ সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আত্মকেন্দ্রিক। তাই তিনি ব্যক্তিকে আত্মমুখী হয়ে অস্তিত্ব তৈরির কথা বলেছেন, এতে কেউ যদি অতিমাত্রায় আত্মমুখী হয় তাহলে সে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং এ বিষয়টি ব্যক্তির বিবেচনায় রাখতে হবে।

জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন ঈশ্বরবিহীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা নামক আনবিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু একটি শিশুর মৃত্যু হলেও কোনো মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হলে এটি নিয়তি বলে আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই দ্বারস্থ হতে হয়, আবার অনেকে মনে করে ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের বোধশক্তির ও জন্ম-মৃত্যুর ধারক ও বাহক। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

জাঁ-পল্ সার্ত্রে মনে করেন, মানুষের কামনা বা পূর্ণতার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু বাস্তবে অনেক ব্যক্তি আছে তারা কোনো পূর্ণতা অর্জনের কামনাই করে না। তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়? এই বিষয়ে সার্ত্রে কোনো বক্তব্য প্রদান করেনি।

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একদিকে অস্তিত্ব সৃষ্টির প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আবার অন্যদিকে, স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার শূন্যতা সৃষ্টির প্রধান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে সার্ত্রের দর্শনের স্ববিরোধিতা প্রমাণিত হয়।

অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তির অনুভূতিকে অতি মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়ায় মানবেতর প্রাণীর দর্শনে পরিণত হয়েছে।

আস্তিত্ববাদী দর্শনে মূলত সত্তা ও শূন্যতা ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করলেও এ দর্শন সত্তা ও শূন্যতার পরিবর্তে সত্তা ও আকর্ষণ বলে বিবেচিত। কেননা সার্ত্রে বলেছেন, ব্যক্তি যে বিশেষ রূপ ধারণ করে, তা যেন সবাইকেই আকর্ষণ করে।

জাঁ-পল্ সার্ত্রে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, ঘৃণা, হতাশা ও উদ্বেগ প্রভৃতি ভুলে মানুষকে অস্তিত্বশীল হতে বলেছেন। কিন্তু আমাদের এদেশে প্রতিদিন পত্রিকাতে দেখা যায় যে, অন্যায়ভাবে খুন, গুম, ধর্ষণ, শিশু হত্যা, ডাকাতি, নারী ও শিশু পাচার, বিভিন্ন ভবনের ধ্বংসের সময় চাপা পড়া মানুষের অঙ্গহানি এবং হরতালের নামে গাড়ির ভিতরে মানুষ পোড়ানো হচ্ছে, আবার রাষ্ট্র কর্তৃক গণহত্যাও চলে। সুতরাং সব ধরনের দুঃখ-বেদনা ভুলে মানুষ অস্তিত্ব তৈরি করবে কীভাবে? যারা এ ধরনের ঘটনার শিকার হোন। তারা তাদের সংকটময় অস্তিত্ব নিয়ে খুবই বিচলিত থাকেন। যেমন, সাভারে রানা প্লাজার ট্র্যাজেডি ব্যক্তিদের অস্তিত্ব এখনো সংকটাপন্ন। এ সম্পর্কে সার্ত্রের দর্শনের বাস্তবতা কোথায়? এ সমস্যা নিরসনে ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার্থে সরকারি আইন ও প্রশাসনিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে নিজস্ব ভাগ্য নসিব তৈরি করে এবং কোনো কিছু নির্বাচনের নিজস্ব বিবেককে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে যৌথ জীবনে প্রবেশ করে সব মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার প্রেরণা প্রদানের জন্য এ দর্শন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। অস্তিত্ববাদ দর্শনের আবিষ্কৃত একগুচ্ছ মূল্যবোধ মানবজীবন কীভাবে সম্পর্কিত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ব্যক্তিসত্তা ও তার স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন । কিন্তু এ স্বাধীনতা নামক আণবিক শক্তি ব্যক্তিসত্তা অনুভব করে কর্মসম্পাদনের সময়। যার মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ নিজের মুক্তি ও অপরকে মুক্তি দিতে পারে এবং একগুচ্ছ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে যা এ দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল্ সার্ত্রে এর দর্শনকে বিশ্লেষণ করলে যেসব দিকগুলো পাওয়া যায়। তা হলো, ব্যক্তিসত্তার যথার্থ লক্ষ্য, আচরণ, বিষয় বা বস্তু নির্বাচন করার জন্য যে স্বাধীন শক্তি ব্যবহার করা হয়, এ স্বাধীন শক্তিই তাঁর সমগ্র দর্শন চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ।

জাঁ-পল্ সার্ত্রে ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে দেখেছেন একটি নিরন্তর ধাবমান অতিক্রমণকারী সত্তারূপে।

ব্যক্তি তার যথার্থ চেতনা দ্বারা দুঃখ, যন্ত্রণা, ঘৃণা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হতাশা, উদ্বেগ ও অভাববোধ ইত্যাদি আঁ-সোঁয়া মনে করে দূর করে নিজেকে শূন্য করলে, তার মন হবে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ।

মানুষ তার স্বাধীন চেতনা দ্বারা প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করে একে সংস্কার ও পরিবর্ধন করে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সহায়তা করে।

অর্থের সাথে সম্পর্কিত বস্তু, প্রযুক্তি ও শিল্প এর সাথে একাকার না হয়ে নিজস্ব স্বাধীন চেতনা দ্বারা ব্যক্তিসত্তা আলাদা করে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

এ দর্শন বিশ্ব মানবতাবাদে বিশ্বাসী বলে শোষণ ও অত্যাচারকে ঘৃণা ও প্রতিবাদ করে, যা সবার জন্য ভালো তা নির্বাচন করে থাকে।

জাগতিক ও অতিপ্রাকৃতিক সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উচ্চ চেতনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজের বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকাকে অস্বীকার করে নিজের উদ্যম কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি স্বভাব, মূল্যবোধ ও ভাগ্য সৃষ্টি করে।

অপর ব্যক্তিকে সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করে নিজের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে। এ দর্শন আত্মগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুগতভাবে পরিবর্তনে বিশ্বাসী।

এ দর্শন বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও ভাববাদী দর্শনকে বিরোধিতা করে। কেননা তিনি সুস্পষ্ট বলতে চান, মানুষের কোনো ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক (ষড় রিপু) কোনো নিয়ন্ত্রণ কর্তা নেই। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চেতনাই সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক। এজন্য সে যা করবে তার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।

এ দর্শন মানুষের স্বতন্ত্র গুণ বা অস্তিত্বকে প্রাধান্য দেয়, যা দ্বারা সে নিজেকে পৃথিবীতে আত্মসম্মানের সাথে টিকে থাকে।

এ দর্শন সর্বোচ্চ ভালো বা সততাকে জীবন পরিচালনার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে।

সর্বোপরি স্বাধীনতা নামক বোধ শক্তি বা আত্মমুখী হয়ে ব্যক্তি নিজস্ব স্বভাবের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বিভিন্ন বিকল্প বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিষয়টা নির্বাচন করে কাজে পরিণত করাই এ দর্শনের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিকাশ ও প্রসার লাভ করে উনিশ শতক থেকে বিশ শতক সময়কালে। এ দর্শন ইউরোপীয় চিন্তাপ্রবাহের আধুনিক দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত। অন্যান্য দর্শনের মতো সার্ত্রে পেশাগত বা তাত্ত্বিক আলোচনা না করে আলোচনা করেছেন যেসব প্রধান বিষয়সমূহ তা হলো, ক) ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব ও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খ) চেতনা ও শূন্যতা গ) ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ঘ) আঁ-সোঁয়া ও পুর-সোঁয়া ঙ) সামজিক সম্বন্ধ ও মানবতাবাদ ইত্যাদি। তাছাড়া মানবজীবনের অতিবাস্তব সমস্যা যেমন, দ্বন্দ্ব-হতাশা, ভয়ভীতি, মনস্তাপ ও সম্ভাবনা ইত্যদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। জাঁ-পল্ সার্ত্রের মূল বক্তব্য, অস্তিত্বই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জানতে হলে তার বাস্তব রূপটিকে দেখতে হবে। আমি একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কীভাবে জীবনযাপন করছি তার বাস্তব চিত্র থেকে আমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে। যুক্তিবাদীরা মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যক্তিমানুষের স্বতন্ত্র বা স্বকীয়তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। সাধারণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার পরিমাপের প্রধান হাতিয়ার হলো যুক্তি। যুক্তির ধর্ম বিশ্লেষণ, এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সবকিছুর মধ্যে সাধারণ ধর্ম খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যক্তির স্বতন্ত্র খুঁজে †পতে হলে প্রতিদিনকার জীবনের বা্স্তব চিত্র দেখতে হয়। যেমন, বিভিন্ন লাল ফুলের রং পৃথক পৃথকভাবে লাল, যুক্তিবাদীদের মতো আমরা যদি এই লাল বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলাদা আলাদা ফুলগুলো একই জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করি, তবে সেটি ভুল হবে। কেননা সাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশেষ ফুলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় না। অনুরূপভাবে, মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে স্বতন্ত্র মানুষকে চেনা যায় না। ব্যক্তিমানুষকে পৃথক করতে হলে তার স্বতন্ত্র গুণাবলি আবিষ্কার করতে হয়। যুক্তিবাদী ও অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে এটি একটি বড় বিতর্কের বিষয়। এ বিতর্ক অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও লক্ষ যায়। বৈশিষ্ট্য বর্জন করে অস্তিত্বকে জানা যায় না এবং অস্তিত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। আধুনিককালে সার্ত্রের এ ধরনের অস্তিত্ব দেকার্ত প্রবর্তিত মন ও বস্তুজগতের দ্বৈতবাদের শেষ স্তর এবং অন্যভাবে বলা যায় যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, বিশ্লেষণবাদ ও বস্তুজগতের অদ্বৈতবাদের প্রচার করছে। অতএব, ব্যক্তিমানুষকে বুঝতে হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তার জীবনসংগ্রামে যে রূপ ফুটে ওঠে, তাই তার অস্তিত্ব । এ ধরনের অস্তিত্ব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা হয়। সার্ত্রের এ ধরনের বক্তব্য সত্যিই ইতিবাচক।

জাঁ-পল্ সার্ত্রে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনে চেতনা সম্পর্কে বলেছেন, চেতনা হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা পদার্থের মতো এক জায়গা স্থির নয়; বরং সে অবিরাম গতিতে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের গতির মধ্যে এক ধরনের সজীবতা আছে, যা নিজের বর্তমানের অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে। এ কারণে সার্ত্রে চেতনাকে পরিবর্তনশীল বলেছেন। এ পরিবর্তনশীলতা আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয় না। সাধারণত বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া আমাদের বাস্তবজীবনকে উদ্ভাসিত করলেও সবকিছুকে এক সূত্রে গেঁথে 'আমি সত্তা'

নামক যে চেতনা লাভ করি, তা আপাত অপরিবর্তনীয় হয়। এখানে চেতনাকে পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল সত্তা বলে সার্ত্রে স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছেন। তবে চেতনা দ্বারা ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যে অভাববোধ সৃষ্টি হয়, তাকে তিনি শূন্যতা বলেছেন। এ শূন্যতা ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মানুষ তার সাময়িকভাবে একটি শূন্যতা পূরণ করতে পারে। কিন্তু পরে আবার শূন্যতা তৈরি হয়। এখানে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে চেতনা থাকায় মানুষ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এ কারণে সার্ত্রে বলেন, একমাত্র বস্তুই পূর্ণ, তার একমাত্র কারণ বস্তুর মধ্যে চেতনা নেই। সার্ত্রের এ ধরনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

সার্ত্রের মতে, মানুষের স্বাধীন সত্তা বন্ধনমুক্ত বা নির্বাধ। যার ফলে মানবিক সত্তাকে বিশেষ নিয়মে বাঁধা যায় না। ব্যক্তিমানুষ নিজেকে যেভাবে গড়ে তোলে সে তাই হবে। এই নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। এটিকে তিনি অস্তিত্ববাদী সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সার্ত্রের মতে, স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। অস্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিলেও সার্ত্রে সব জায়গা অস্তিত্বের প্রাধান্য মানতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মানুষের সাধারণভাবে যা আছে তা প্রকৃতি নয়, একটি শর্ত অর্থাৎ কতকগুলি বাধা ও নিষেধের সমষ্টি; যেমন, মৃত্যুর অনিবার্যতা, বেঁচে থাকার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা, একই জগতে অন্য মানুষের সাথে থাকা। এ শর্ত মৌলিক মানবীয় পরিস্থিতি কিংবা বলা যায় সমস্ত পরিস্থিতির সাধারণ কতকগুলো বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য।" এ বাক্যগুলোর মধ্যে সার্ত্রে সকল মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের চিত্র অংকন করেছেন। অতত্রব একথা সার্ত্রেকে মানতে হবে যে, সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে মানুষের অস্তিত্বকে পাওয়া যায় না। সাধারণ অস্তিত্ব সার্ত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণ করেও পরে তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষেরই পরিপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে তাকে স্বাধীন সত্তা নামক চেতনা দ্বারা কোনো প্রকল্পকে নির্বাচন করতে হয়। এ প্রকল্পকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি পূর্ণতা অর্জন করে। কিন্তু সার্ত্রে বলেন, মানব চেতনা জড়ত্বের মতো পূর্ণতা পেতে চায়, অথচ সে চেতনা বহাল রাখতে চেষ্টা করে। তাই চেতনা ও পদার্থের মিলনই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ ধরনের মিলন একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। কিন্তু এ মিলন সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরের ধারণাকে বিরোধপূর্ণ বলে বাতিল করেন। কেননা, চেতনসত্তা পক্ষে পূর্ণতা (স্বস্থিত সত্তা) অর্জন করা সম্ভব নয়। তাহলে ঈশ্বরের ধারণা বাতিল করে মানবপ্রকৃতির চারটি স্বরূপের কথা বলেন, ক. মানুষ হচ্ছে অবস্তু (পুর-সোঁয়া), খ. সে সবসময় ভালো নির্বাচন করে, গ. সে ঈশ্বরের মতো পূর্ণতা লাভ করতে ইচ্ছা পোষণ করে, ঘ. সে স্বাধীন হতে চায়। আর স্বাধীন সত্তার দ্বারাই ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বভাব, মূল্যবোধ ও ভাগ্য নির্মাণ করে; যেন সে সকল মানুষের আদর্শ (মডেল) হতে পারে। এসব কারণে এ দর্শনকে অস্তিত্ববাদ না বলে মানুষের আত্মনির্মাণের দর্শন বলে আখ্যা দেওয়া যায়। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ দর্শনের বাইবেল হিসেবে খ্যাত 'সত্তা ও শূন্যতা' গ্রন্থে অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে দুভাগে ভাগ করেছেন। ক. পুর-সোঁয়া বা স্বহেতু সত্তা (Being-for-itself) খ. আঁ-সোঁয়া বা স্বস্থিত সত্তা (Being-in-itself)।

এর মধ্যে ব্যক্তিমানুষকে স্বহেতু সত্তা (Being-for-itself) বলেছেন, তার পিছনে প্রধান যুক্তি হচ্ছে মানুষের মধ্যেই অভাববোধ (শূন্যতা) রয়েছে, যা চেতনার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। আর জগতের সকল বিষয়, বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং যে মানুষগুলোর মধ্যে স্বাধীন চেতনা শক্তি নেই; তারা শুধু বস্তুর মতো আছে সেই মানুষকেও তিনি স্বস্থিত সত্তা (Being-in-itself) বলেছেন। তবে সার্ত্রে ব্যক্তি মানুষের মনোবিশ্লেষণ করে বলেন, প্রতিটি মানুষ স্বস্থিত সত্তা মতো পরিপূর্ণ বা অভাবহীন হতে চায়। কিন্তু চেতনা হারাতে চায় না।_এজন্য স্বাধীন ব্যক্তিমানুষ কখনো স্বস্থিত সত্তা হতে পারে না। এ উক্তিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলেও যেসব ব্যক্তিমানুষ নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বা নিজের স্বভাব বদলাতে চায় না (সে যা তাই থাকতে চায় অর্থাৎ ফ্যাক্টিসিটি মতো) এবং যাদের অভাববোধ সম্পর্কে কোনো চেতনা নেই তাদের ক্ষেত্রে সার্ত্রের দর্শন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে এ দর্শনের প্রচারে দশাগ্রস্ত (ফ্যাক্টিসিটি) মতো মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি সে নিজেকে বদলাতে পারবে। ব্যক্তিমানুষ তার সম্ভাবনাকে বিকশিত করে শুধু সে ভোগ করবে তা নয়; বরং সে সব মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। জাঁ-পল্ সার্ত্রে মানুষকে যথার্থ অস্তিত্বশীল হওয়ার আহ্বান করেছেন। এটি একমাত্র সম্ভব হবে স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। সার্ত্রে নিজ জীবনের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রয়োগ করেছেন এবং প্রত্যেক মানুষকে তাঁর মতো করে দর্শন প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি স্বাধীনতাকে কীভাবে নিজস্ব জীবনে প্রয়োগ করেছেন তা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রেমিকা সিমনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়।

> জাঁ-পল্ সার্ত্রে ফরাসি দর্শন-সাহিত্যের এক কিংবদন্তী প্রবাদপুরুষ। তাঁর গভীর অনুভূতি, স্বতন্ত্র ধরনের মানসিক প্যাটার্ন, প্রচলিত মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সম্পর্কে সংশয়াতুর তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব, মানবদরদি মন, পরিণত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শক্তিশালী রাজনীতি চেতনা তাঁকে প্রত্যয়নিষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দান করেছে। যাঁদের অন্তর্জীবনে থাকে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা ও যাঁরা দায়দায়িত্বকে মহৎ সাহিত্যিক–দার্শনিক নৈতিক, রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেন, সার্ত্রে তাদেরই একজন।[193]

সিমনের এ বক্তব্যের মধ্যেই একজন অস্তিত্ববাদী মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, সচেতন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা যা তাকে করে তোলে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি হিসেবে। মানবজীবন ফুলশয্যা নয়; তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে আনার জন্য মানুষকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হয়। এ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মানুষ তার অন্তরস্থিত সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। আর এ অন্তর্যামী সত্তাকেই জাঁ-পল্ সার্ত্রে ‘কর্তৃসত্তা’ (পরিচালনাকারী শক্তি) বলেছেন

193 সিমন দ্য বোভোয়ার, mwnZ¨ I ms¯‹wZ, ˆÎgwmK cwÎKv, পঞ্চদশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ. ৫২৩।

বলে গবেষক মনে করেন। অন্তরস্থিত সত্তাই চেতন ও অচেতন, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, মহৎ-অমহৎ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

সার্ত্রের সামজিক সম্বন্ধ ও মানবতাবাদ আলোচনায় বলা যায় যে, সার্ত্রের দর্শন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় মধ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর পিছনের কারণ হিসেবে যায়, হুসার্লের প্রতিভাস বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রয়োগ। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, চেতনা ও জড়পদার্থের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান এবং পরে তাঁর বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই কথাকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। সার্ত্রের এ বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে সিদ্ধান্ত এসেছে তা হলো, ব্যক্তি সার্বভৌম এবং যাদের নিয়ে সমাজবদ্ধ এ মানবজীবন সেই অপর ব্যক্তিকে ব্যক্তির প্রতিবন্ধক ও শত্রু মনে করেছেন। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক তিনি ভালো চোখে দেখেননি। ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সম্পর্ককে হিংসা চোখে দেখেছেন। তাইতো সার্ত্রে তাঁর 'ইন ক্যামেরা' তে বলেছেন, 'অপর ব্যক্তি হচ্ছে নরক'। কিন্তু অন্যান্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরাও প্রতিভাস পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন, অথচ তারা অন্য ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ থেকেই সার্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। তাছাড়াও সার্ত্রের গোষ্ঠী চেতনার পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ। এখানে তিনি মানবজীবনের সমাজবদ্ধ হওয়ার দুটি মূল্যবান সম্পদ প্রেম ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং 'নাসিয়া' নামক গ্রন্থে সমাজবদ্ধ এ জগতের প্রতি একটা বিতৃষ্ণাভাব পোষণ করেছেন। আর তাঁর বিতৃষ্ণাভাব থেকে জন্ম হতাশা ও নৈরাশ্য। এ হতাশা ও নৈরাশ্যের পরিবর্তে মানবজীবনে অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই আশা ও প্রেরণা এবং ব্যক্তি প্রতি অপর ব্যক্তির মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। এখান থেকে বলা যায়, সার্ত্রের এ ধরনের অভিজ্ঞতায় সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। ফলে তাঁর সমস্ত বিশ্লেষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সার্ত্রে মানবতাবাদ নিয়ে আলোকপাত করেছেন, তাঁর 'অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ' গ্রন্থে। তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেছেন, যখন মানুষ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন সমস্ত মানুষের হয়েই সিদ্ধান্ত নিবে। সার্ত্রে বলেন, পৃথিবীতে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার জন্য ব্যক্তিমানুষই দায়ী এবং ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ ঘটবে তার জন্য ব্যক্তিমানুষই দায়ী হবে, কারণ সে যুগের সাথে একাত্মতা অনুভব করছে। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, সার্ত্রের এই ধরনের মনোভাবকে দুঃখময় জীবনের ব্যক্তিমানুষের সাথে এক করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে নিপীড়িত-নির্যাতিত দেশপ্রেমিক, অত্যাচারিতা বারবণিতা, সমস্ত মানুষের পাপের বোঝায় দুঃখক্লিষ্ট মানুষের ভীড়। এ মনোভাবই তাঁকে নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছে, সমস্ত মানুষের জন্য শান্তিময় ভবিষ্যতের কথা তিনি ভেবেছেন। কিন্তু এ দর্শন পড়লে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে উদয় হতে পারে, সার্ত্রে ব্যক্তিমানুষ বলেছেন, নিঃসঙ্গ দ্বীপ, অন্যের শত্রু এবং অন্য ব্যক্তি হচ্ছে নরক তাহলে কীভাবে তা থেকে মানবতাবাদের জন্ম হতে পারে? এখানেই সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন স্ববিরোধিতায় পতিত হয়েছে। কারণ একদিকে তিনি ব্যক্তির স্বাধীন

বা সার্বভৌম সত্তাকে বজায় রাখতে চান, তাকে বৃহত্তর জীবন থেকে সরিয়ে এনে স্বার্থ মগ্নতায় নিমজ্জিত রাখতে চান; অন্যদিকে তিনি শান্তি, সমাজবদ্ধ জীবন ও মানবতাবাদের স্বপ্ন দেখেন। অথচ তিনি দুয়ের যোগসূত্রকে পৃথক করেছেন। তাই তাঁর এ দর্শন একদিকে জীবনচেতনা, অন্যদিকে জীবনবিমুখতায় পরিচয় দিয়েছেন। এই দু'ভাবে পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি স্পন্দনকে উপলব্ধি করার নামই জীবন। আবার যখন তিনি বলেছেন, ব্যক্তিই সব, নিঃসঙ্গ ব্যর্থতাতেই তার জীবন পূর্ণ। তখন তিনি জীবনবিমুখ।

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ দর্শনের নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর এ অস্তিত্ববাদী দর্শন মানবতাবাদী, কল্যাণধর্মী ও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী । এ দর্শন মানবজীবনে প্রয়োগ করলে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষ হবে জীবনমুখী ও কর্মমুখী এবং সে নিয়তির ওপর নির্ভর না করে নির্ভর করবে নিজের স্বাধীন সত্তার ওপর। কারণ মানুষের ভবিষ্যৎ কোনো স্বর্গে তার জন্যে আগে থেকে কেউ তৈরি করে রাখে না। তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়ার যেমন কেউ নেই সামনে থেকে টানারও কেউ নেই। কেননা সে মুক্ত, স্বাধীন এবং সে কারো নয়; বরং সে একা। সে ক্রীতদাস হবে নাকি জমিদার হবে? অনুরূপভাবে সে প্রভু হবে নাকি শয়তান হবে? মানবজীবনের সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো পরাজয়, দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার শিকার হলে ব্যক্তিমানুষ তার ভাগ্যকে দোষ না দিয়ে দিবে সময়ের অবহেলা, নিজের অজ্ঞতা ও অসতর্কতাকে। কেননা মানুষ নিজেকে সৃষ্টি না করলেও সে যা করে তার জন্য সব দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়। আর এ দায়িত্বের দায় বহন করতে হয়, মানুষ যখন স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে কাজ করে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার পিছনে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে, তা একটি বিমূর্ত কাহিনি অবলম্বন করে বিষয়টিকে তুলে ধরা হলো। যেমন, খনির ভিতরে কয়লা বলছে হীরককে আমরা তো সঙ্গী, একই তো আমাদের সত্তা। তবু আমি মরে যাচ্ছি যন্ত্রণায় তুমি শোভা পাও রাজমুকুটে। আমি কুৎসিত, তুমি সৌন্দর্যে বিকশিত। আমি শুধু ভস্ম, ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আর তুমি? জ্যোতি বিভাসিত তারকা। কখনো তুমি রাজার চোখের মণি, কখনো তার তরবারির হাতল। শুনে হীরা বলে, মলিন মাটি কঠিন হলে তার মর্যাদা হয় পাথরের মতো। সংগ্রামে সে কঠোর হয়ে ওঠে। তোমার সত্তা পরিণত নয়, তাই তুমি হয়েছ নিচ, তুমি কোমল, তাই দগ্ধ হয়ে যাও। ছেড়ে দাও দুঃখ, উদ্বেগ, ভয়, পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠো। হয়ে ওঠো এক হীরক খণ্ড। দুর্বলতাই তুচ্ছতা, দুর্বলতা অপরিণতি। সংগ্রামের মধ্যেই আছে জীবনের পরমতা ও গৌরব। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার জীবনকে গড়ে তুলবে হীরকের মতো। কেননা সব মানুষের সত্তা একই থাকা সত্ত্বেও জীবন গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাভিত্তিক কর্ম না করার কারণে কিছু মানুষ হয় কয়লার মতো আর কিছু মানুষ হয় হীরার মতো মূল্যবান। তাই এ দর্শন মানবজীবনে প্রয়োগ করলে অযথার্থ (কয়লার মতো) মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষে (হীরার মতো মূল্যবান)। আর একজন যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ সাগ্রহে

ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে। বিভিন্ন বিকল্প বিষয়কে বিবেচনা করে সঠিক নির্বাচন করবে। একই সাথে তা নিজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। এজন্য জাঁ-পল্ সার্ত্রে তার এ দর্শনে মানুষকে হিংসা, বিদ্বেষ, নেতিবাচক স্বার্থ চিন্তা, যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায়-অত্যাচার না করে নৈতিক ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে, সার্ত্রে নিষ্পাপ অপরাধী পরিবারের সদস্যদেরকে বাঁচাতে গিয়ে একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে গিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নিজ হাতে পরিবারবর্গকে সাহায্য করেন এবং উৎফুল্ল চিত্তে একক জীবন পরিহার করে যৌথ জীবনে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ব্যক্তিমানুষের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে সমাজজীবনে নিয়ে এসেছেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় ঐক্য বা যুথবদ্ধ জীবন। এই সংঘবদ্ধ জীবন যা বিভ্রান্তিকর বিশ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে ভবিষ্যতে মানুষ রক্ষা করবে বলে তিনি তাঁর জীবনকালে বিশ্বাস করেছেন। এছাড়া তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদ দর্শন প্রকাশ করেছেন। যেমন, সার্ত্রের 'নশিয়া' উপন্যাসের নায়ক অ্যান্থোনি রুখেটিন তার স্বেচ্ছাচারী অপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নিজে একজন লেখক হয়ে উঠেছিলেন। সার্ত্রের এ অস্তিত্ববাদের দর্শনে এ পরিবর্তন একমাত্র স্বাধীনচেতনার মাধ্যমে সম্ভব। একজন যথার্থ মানুষের সার্থক পরিণতি ও মেকী মানুষের শাস্তির চিত্র তুলে ধরেন তার Flies নাটকের মধ্য দিয়ে। আবার এখানে ওরেস্টিসকে আদর্শ মডেল হিসেবে বেছে নিয়ে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এবং তার যথার্থ অস্তিত্বও তুলে ধরেন। সর্বোপরি, এ অস্তিত্ববাদ দর্শন মানবজীবনে প্রয়োগ করলে প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষ হবে খাঁটি সোনার মতো। যে মানুষকে সাধনার মধ্য দিয়ে নতুন কিছু হয়ে উঠবে। নতুন কিছু হয়ে ওঠার মানুষই খাঁটি মানুষ, আর এক একটি খাঁটি মানুষ (Authentic Being) হওয়ার মধ্য দিয়ে গোটা অসুস্থ সমাজব্যবস্থা সুস্থ ধারায় প্রবাহিত হবে। এজন্য বলা যেতে পারে, অস্তিত্ববাদ দর্শন মানবজীবনে রোগ প্রতিষেধক বা থেরাপি হিসেবে কাজ করে, জীবনবিমুখ, হতাশাগ্রস্ত, রুগ্ন এবং স্থূল ব্যক্তিমানুষকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে ও কোনোকিছু সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন কিছু হয়ে উঠতে সাহায্যে করে। এটিই ছিল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলমন্ত্র।

cv_wgK Drm

Rv-cj mv‡Îi gj MšcwÄ : Bs‡iwR

Sartre', J.P., Being *and Nothingness,* trans. H. E. Barnes, London, Methuen & Co. Ltd, 1957.

Sartre', J.P., *Existentialism and Humanism,* trans. Philip Mairit, London, Methuen & Co. Ltd. 1948.

Sartre', J.P., The flies (Les Mouches), translated by Stuart Gilbert, London, Hamish Hamilton, 1958.

Sartre', J.P., *Words*, translated by Irene Clephane, London, Hamish Hamilton, 1964.

Sartre', J.P., of *Human Freedom,* Edited by Wade Baskin, NewYork, philosophical Library, 1966.

Sartre', J.P., Situations, translated by George Braziller, New York, Park Avenue South, 1965.

Sartre', J.P., Intimacy *and other stories,* translated by Lloyd Alexander, London, Pater Neville Limited, 1949.

Sartre', J.P., The *Wall,* translated by Lloyd Alexander, London, Pater Neville Limited, 1949.

Sartre', J.P., *The Age of Reason*, trans. by Eric Sutton, New York, Bantam Books, 1995

Sartre', J.P., The *Transcendence of the Ego,* trans. by Forrest Williams and Robert Kirkpatrick, New York, Noonday Paperbacks, 1957.

Sartre', J.P., The *Room,* translated by Lloyd Alexander, London, Pater Neville Limited, 1949.

Sartre', J.P., *Existentialism,* trans. By Bernard frechtman, New York, Philosophical Library, 1947.

Sartre', J.P., *The Erostratus,* translated by Lloyd Alexander, London, Pater Neville Limited, 1949.

Sartre', J.P., *No Exist,* translated by Stuart Gilbert, New York, Vintage Books, 1955.

Sartre', J.P., The *Reprieve,* translated by Eric Sutton, New York, Bantam Books, 1960.

Sartre', J.P., *The Childhood of the Leader,* translated by Lloyd Alexander, London, Pater Neville Limited, 1949.

Sartre', J.P., The *Devil and the Good Lord,* translated by Kitty Black, New York, Alfred A. Knopf, 1960.

Sartre', J.P., *Critique of Dialectic Reason*, translated by Joseph S Catalano, Chicago, The University of Chicago Press Chicago. 2013.

.

^ØZwqK Drm Rv-cj mv‡Îi gj MšcwÄ : evsjv
Aiæb wgÎ (m¤úvw‘Z), Rv-cj mv‡Î I Zvi msjvc, Abev‘msMn 1, wPb¥q ¸n, KjKvZv, MvOwPj cKvk, 2012|
Aiæb wgÎ, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Î, Aw¯ÍZev‘ I gvbexq Av‡eM, KjKvZv, ‘xcvqb, 2012|
Drcj fÆvPvh, (m¤úvw‘Z), Rv-cj mv‡Î, g‡LvgwL, KjKvZv, KweZv_ miwY, 2012|
†MŠZg fÆvPvh, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Î, gwQ, KjKvZv, c¨wcivm cKvk, 2005|
gYvjKwšÍ f‘, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Î, ‘kb I mwnZ¨, eagvb, eagvb wekwe‘¨vjq cKvk, 1999|
gYvjKwšÍ f‘, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Î, Aw¯ÍZev‘ I gvbeZvev‘, eagvb, eagvb wekwe‘¨vjq cKvk, 1991|
gYvjKwšÍ f‘, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Îi, mËv I kb¨Zv, KjKvZv, weÁvcbce cKvk (1), 2000|
gYvjKwšÍ f‘, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Îi, Aw¯ÍZev‘ I gvbeZvev‘, eagvb, eagvb wekwe‘¨vjq cKvk, 1994|
†jvKbv_ fÆvPvh, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Îi, kã, KjKvZv, mwnZ¨ GKv‡Wgx cKvk, 2005|
wkebvivqY, (fvlvšÍi), Rv-cj mv‡Îi, †bvsiv nvZ, KjKvZv, meY‡iLv cKvk, 2011|

mnvqK Mš : Bs‡iwR

Name of Authors	Name of the Books
Barrett, W.	*Irrational Man,* Heinemann, London Melbourne Toronto, 1961.
Blackburn, S.	*The Oxford Dictionary of Philosophy*, New York, Oxford University Press, 1996.
Blackham, H. J.	*Six Existentialist Thinkers,* London, Routledge and Kegan Paul, 1952.
Blackham, H. J.	*Objections to Humanism,* England, Penguin Books Ltd. 1963.
Buber, M.	*Between Man and Man*, trans. by Ronald Gregor Smith. Boston, Beacon Paperbacks, 1955.
Buter, M.	*Eclipse of God*, trans. by Maurice Friedman et al, New York, Harper Torch Books, 1957.
Campbell, J. K.	*Free Will,* Cambridge, Polity Press 65 Bridge Street, 2011.
Charles A. Baylis	*Metaphysics,* New York, The Macmillan Company, 1965.
Clark, T.	*Martin Heidegger,* London and New York, Routledge, 2002.
Clark, T.	*Simone de Beauvoir,* London and New York, Routledge, 2004.
Collins, J.	*The Existentialists,* Chicago, Henry Regnery Company, 1968.
Descartes, R.	*A Discourse on Method, London,* J. M. Dent & Sons Ltd. 1949.
Friedman, M.	*The Worlds of Existentialism A Critical Reader*, New York, Random House, 1964.

Grimsley, R.	*Existentialist Thought*, Cardiff, University of Wales Press, 1955.
Grossmann, R.	*The Existence of the World*, London and New York, Routledge, 1994.
Guha, C.	*Sartre's Remembering,* Kolkata, Das Gupta & Co. Pvt. Ltd. 2007.
Harold Titus, H.	*Living Issues in Philosophy*, New Delhi, Eurasia Publishing House, 1968.
Hegel, G. W. F.	*Phenomenology of Mind,* London, Swan Sonnenschein & Co., Limited, 1910.
Heidegger, M.	*Existence and Being*, trans. by Werner Brock, Cicago, Henry Regnery Co. 1949.
Heidegger, M.	*Basic Writings*, London, Routledge, 1993.
Heidegger, M.	*Existence and Being,* London, Vision Press Ltd. 1968.
Heidegger, M.	*Letter on Humanism*, trans. by Edith Kren, Bren, A. Francke verlag, 1947.
Heil, J.	*The Nature of True Minds*, New York, Cambridge University Press, 1992.
Homer, S.	*Jacques Lacan*, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2005.
Husserl, E.	*Cartesian Meditations*, trans. by Dorion Cairns, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960.
Jain, G.	*The Hindu Phenomenon*, New Delhi, UBS Publisher's Distributors Ltd. 1994.
Jane Oakbill, A. G.	*Thinking and Reasoning*, Oxford & Cambridge USA, Blackwell Publishers Ltd. 2001.
Jaspers, K.	*The Origin and Goal of History*, London, Routledge & Kegan Paul Ltd. 1953.

Jaspers, K.	*The Perennial Scope of Philosophy*, New York, Philosophical Library, 1949.
Kafka, F.	*Parables and Paradoxes,* in German and English, New York; Schocken Paperbacks, 1961.
Khiyabich	*An Outline History of Philosophy*, Moscow, Progress Publisher, 1912.
Kierkegaard, S.	*The Concept of Dread,* trans. by Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press, 1944.
Kierkegaard, S.	*Concluding Unscientific Postscript*, trans. by David F. Swenson, *Princeton,* Princeton University Press, 1944.
Kierkegaard, S.	*Purity of Heart*, trans. by Douglas V. Steere, New York, Harper Torchbook, 1956.
Kierkegaard, S.	*The point of view*, trans. by Walter Lowrie, London and New York, Oxford University Press, 1939.
Korner, S.	*Kant,* Canada, Penguin Books, 1955.
Macann, C.	*Four Phenomenological Philosophers,* London and New York, Routledge, 2002.
Macquarrie, J.	*Existentialism,* New york, World Publishing Co. Ltd. 1980.
Marcel, G.	*The Existential Background of Human Dignity*, Harvard university Press, Cambridge Massachustts, 1963.
Maritain, J.	*Existence and the Existent*, New York, Pantheon Books, 1973.
Mayer, E.	*A History of Modern Philosophy,* London, Princeton University Press, 1946.
Moran, D.	*Introduction to Phenomenology,* London, Routledge, 2000.

Morris, R., and Ward, G.	*The Cognitive Psychology of planning*, Hove and New York, Psychology Press Talor & Francis Group, 2005.
Mukerjea, J. S.	*Humanism*, D.G. Lawate, Nagpur, 1969.
Nietzsche, F.	*The Man and his Philosophy,* Hollingdale, R. J., trans. London, Routledge & Kegan Paul, 1965.
Plato & Xenophon	*Socratic Discourse*, Introduction by Lindsay, A. D., London, J. M. Dent & Songs Ltd. 1954.
Robert, W. W., & Norman F. W.	*The Abnormal Personality*, New York, The Ronald Press Company, 1973.
Rosenzweig, F.	*The New Thinking,* New York, Schocken books, 1953
Rosmini, A.	*The Origin of Thought*, Durham, Rosmini House, 1876.
Roubiczek, P.	*Existentialism for and against*, London, Cambridge at the University Press, 1966.
Strawson, P. F	*Individuals,* London, Methuen & Co. Ltd. 1959.
Warnock, G. J.	*The Philosophy of Perception,* London, Oxford University Press, 1977.
Warnock, M.	*Existentialism*, New york, Oxford University Press, 1986.
Wild, J.	*Existence and the World of Freedom,* USA, Northwestern University, 1963.
Wild, J.	*The challenge of existentialism*, Indian University Press, Bloominggton & London, 1966.
Williams, C. J. F	*What is Existence,* Oxford, Clarendon Press, 1981.
Wouldwearth and Marquish	*Psychology,* London, Methuen & Co. Ltd. 1964.

Dhaka University Institutional Repository

mnvqK MšcwÄ : evsjv

অরুণ মিত্র, Abev‘msMn 1, সম্পাদনা: চিন্ময় গুহ, কলকাতা, গাঙচিল প্রকাশ, ২০১২।

আলব্যের কামু, ‘¨wg_ Ae wmwmdvm, অনুবাদ, মনোজ চাকলাদার, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, কলকাতা, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ২০১০।

আমিনুল ইসলাম, ‘kb fvebv mgm¨v I m¤úvebv, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ, ২০০৯।

আমিনুল ইসলাম, †Mvwe›‘ P›‘ †‘e, Rxeb I ‘kb (১৯০৭-১৯৭১), সূচীপত্র প্রকাশ, ২০০৮।

আমিনুল ইসলাম, evOvwji ‘kb I Ab¨vb¨ ceÜ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ, ১৯৯৪।

আমিনুল ইসলাম, AvaywbK cvðvZ¨ ‘kb, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ, ২০০১।

উইলিয়াম গডউইন, evYx wPiš Íbx, তপন রুদ্র সংকলিত, ঢাকা, সালমা বুক ডিপো প্রকাশ, ২০০৭।

এ. কে. এম সালাহউদ্দিন, i¡cZË, ঢাকা, রাদ্ধ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭।

নীরুকুমার চাকমা, Aw¯ÍZev‘ I e¨w³¯vaxbZv, ঢাকা, বাংলা একাডেমি প্রকাশ, ১৯৯৭।

নূরনবী, c‡qvMev‘ I gvbeZvev‘ Ges Aw¯ÍZev‘ I hw³h³ ‘óev‘, ঢাকা, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৯।

বার্ট্রান্ড রাসেল, cvðvZ¨ ‘k‡bi BwZnvm, অনুবাদ, ডক্টর প্রদীপ রায়, ঢাকা, অবসর প্রকাশ, ২০০৬।

বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), wK‡q‡KMvW, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৫।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, Dcb¨vm mgM, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, অবসর প্রকাশ, ২০১১।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ms¯‹wZ K_v, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশ, ২০০৪।

যজ্ঞেশ্বর রায়, Rv-cj mvÎ I gvKmev‘, কলকাতা, প্যাপিরাস প্রকাশ, ২০০৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, gvb‡li ag, ঢাকা, বুক ক্লাব প্রকাশ, ২০০৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, iex›‘-iPbvejx (m¤úvw‘Z), 12 bs LÐ, ঢাকা, ঐতিহ্য প্রকাশ, ২০০৬।

রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, cvðvZ¨ ‘k‡bi i¡c‡iLv, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯২।
শ্রাবন্তী ভৌমিক, †e‡P _vKvi ‘kb, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৮।
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, w‘e¨-Rxeb, ভারতবর্ষ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী প্রকাশ, ২০০৭।
সিরাজুল ইসলাম, ceÜ mgM 1, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ২০০২।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের মনুষ্যত্বের সংকট, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৯।
সৌমিত্র শেখর (সম্পাদিত), বিভূতিভূষণ, K_v I mvwnZ¨, ঢাকা, উত্তরণ প্রকাশ, ২০০৯।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, Rxeb‘kb I mvwnZ¨Kg, জীনাত ইমতিয়াজ আলী সম্পাদিত, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১।

Rvbv©j : Bs‡iwR

Frederick, J. E. *Woodbridge and Wendell T. Bush, The Journal of Philosophy,* inc. Volume XC, Number 1, January 1993.

Frederick, J. E. Woodbridge and Wendell T. Bush, *The Evolution of Human Altruism The Journal of Philosophy,* inc. Volume XC, Number 1, January 1993.

Gustaf, E. K., Founded by, *The Journal of English and Germanic Philosophy,* U S A, published quarterly by the University of Illinois Urbana, 1940.

Williamson, G., Edited by, *Modern Philosophy,* Illinois, The University of Chicago Press Chicago. Volume Fifty 1952-1953.

Manly, J. M., Edited by, *Modern Philosophy,* Volume Twenty-one 1923-1924, Illinois,The University of Chicago Press Chicago, Illinois.

মো, এলামউদ্দিন, নজরুল সাহিত্যের দার্শনিক অঙ্গীকার, The Jahangirnagar Review Part C, vol. xv & xvi, 2003-2004 & 2004-2005.

Rvbv©j I cwÎKv : evsjv

অরুন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), Ges GB mgq, সাহিত্য ত্রৈমাসিক, উথ্থক প্রকাশনী, কলকাতা, মহারানী, ইন্দিরা দেবী রোড, চতুর্বিংশ বর্ষ ৭৮তম বর্ষ সংখ্যা ১৪১৪।

আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), gwmK cwÎKv, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্বরবৃত্ত সাহিত্য ঘর প্রকাশ, ২০১২।

আনিসুজ্জামান, AvPvh wb¤v‡Ki ‘kb I wekkwšÍ, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৮: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৮।

গালিব আহসান খান, f‡Mvj, ms¯wZ I wbqšYev‘, দেব স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ২০১৩।

চন্দন ঘোষ ও রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, †PZbv, wkí mwnZ¨, mgvR I ivRbxwZ welqK ˆÎgwmK, বরাসাত, নবপল্লী লটারী কালীবাড়ি, উত্তর ২৪, পরগনা, ৯ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪।

নীরুকুমার চাকমা, ‘kb I mwnZ¨: mv‡Îi Aw¯ÍZev‘ I mwnZ¨, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

পরেশচন্দ্র মণ্ডল ও নারায়ণ বিশ্বাস, cvP¨we‘¨v cwÎKv, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০০১।

পারভীন আক্তার, gvbe Dbq‡b gvbeZvev‘, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৩: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬।

বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), bxr‡k, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০১।

বীতশোক ভট্টাচার্য এবং সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), mvwnZ¨ I ms¯wZ ˆÎgwmK cwÎKv, কলকাতা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯।

বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), Rv-cj mv‡Î, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০৬।

বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), bxr‡k, কলকাতা, এবং মুশায়েরা প্রকাশ, ২০০১।

মাসুদ আলম, Ri_¨ I Zvi agZË: GKwU mgxÿv, দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৪: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৭।

রবিন ঘোষ (সম্পাদিত), ewlK msL¨v 2012, কলকাতা, ৪৬ বিজ্ঞাপনপর্ব, ১৪ হেয়ার স্ট্রিট, ৪০তম বর্ষ।

সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), wmgb ‘¨ †ev‡fvqvi, mvwnZ¨ I ms¯wZ ˆÎgwmK cwÎKv; কলকাতা, ৩৮/এ/১,নবীনচন্দ্র রোড, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯ ।